ভারতীয় বিদুষী

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(পঞ্চম সংস্করণ)

মূল্য দশ আনা

কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৫

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

পাপড়ি (ছোট গল্প) ভালো বাঁধাই		...	১৲
মহুয়া (ছোট গল্প)	...	...	॥০
ঝাঁপি (ঐ)	...	...	॥০
আল্পনা (ঐ)	...	...	॥০
কল্পকথা (ঐ)	...	...	॥০
জলছবি (ঐ)	...	...	॥০
ভাগ্যচক্র (বিদেশী উপন্যাস)		...	১৲
জাপানী-ফানুস (সচিত্র শিশুপাঠ্য)		...	॥০
ঝুমঝুমি (ঐ)	...	...	।৵০
কাদম্বরী (সম্পাদিত)	...	...	॥৵০
বেতালপঞ্চবিংশতি (ঐ)		...	॥৵০
ভুতুড়ে কাণ্ড (ছাপা নাই)		...	
মোমের ফুল (যন্ত্রস্থ)		...	

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজনীয়া

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

আমাদের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই কোনো না কোনো ভারতীয় বিদুষী সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন। সেই সমস্ত ভারতীয় বিদুষীর আখ্যায়িকা একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইল। আমাদের প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ছিল না; কোনো কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে যে-সকল অসাধারণ ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই যৎসামান্ত উপাদানই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান উপজীব্য। ভারতীয় বিদুষীর পরিচয় কত কাব্য পুরাণ ও ইতিকথার মধ্যে বিক্ষিপ্ত

হইয়া আছে; তাহার সকলগুলিই যে এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে এমন কেহ মনে করিবেন না। এই বিক্ষিপ্ত অপ্রচুর উপাদান হইতে আহরণ করিয়া কতিপয় ভারতীয় বিদুষীর পরিচয় একত্র করা গেল। কিন্তু এই সঞ্চয়ের মধ্যে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে প্রাচীন ভারতের শেষ যুগ পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাদুর্ভূত বিদুষীগণের একটি সুশৃঙ্খল বর্ণনা দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এই স্বল্পসংখ্যক বিদুষীর বর্ণনা পাঠ করিলেই প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন ভারতীয় নারীসমাজ চিরদিন এমনই উপেক্ষিত, অবরোধের মধ্যে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞ হইয়া ছিলেন না। তাঁহারাও বিদ্যায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেন এবং তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা বলিয়া ধিক্কৃত হইত না। যতদিন ভারতবর্ষ জ্ঞান-গরিষ্ঠ বলিয়া পূজিত ততদিন পর্য্যন্ত দেখা যায়

ভারতীয় নারীসমাজও সেই অর্ঘের অংশ লইয়াছেন। এবং যখনই নারীসমাজ অবরুদ্ধ উপেক্ষিত ও শিক্ষাহীন তখনই ভারতও হীন হইয়া শুধু প্রাচীন কালের দোহাই দিয়া কোনমতে টিঁকিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

ভারতীয় বিদুষীর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি রমণীর অতীত কি উজ্জ্বল, কেমন সুপ্রতিষ্ঠ। যাহার অতীত উজ্জ্বল ছিল তাহার ভবিষ্যৎও অন্ধকার নয়। ভারতের সকল নরনারী এই সত্য একদিন গূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এইরূপ নানা উপলক্ষ ধরিয়া আমাদের সমস্ত অবনত সমাজ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান হইয়া উন্নত হইয়া উঠিবেই—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে।"

সূচী

ভারতীয় বিদুষী

ভারতের রমণী যে শুধুই সতীত্বে পাতিব্রত্যে অতুলনীয়া ও চিরস্মরণীয়া তাহা নহে ; বিদ্যাবত্তাতেও তাঁহারা পরম কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সে পরিচয় বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কালেই পাওয়া যায়।

এখন আমরা শুনিতে পাই যে বেদপাঠ—এমন কি বেদ-শ্রবণেও রমণীগণের অধিকার

নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই রমণীগণই এককালে বেদের মন্ত্র রচনা করিতেন। রমণীর স্বাধীনতা তখন পুরুষের কাছে খর্ব্ব করা হয় নাই।

সভ্যতার আদিম যুগে, হিংস্রপশুসমাকুল অরণ্যমধ্যে শান্তিশ্রীসম্পন্ন পর্ণকুটীরপ্রাঙ্গণে বৃক্ষছায়ায় শুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণ হোমানল প্রজ্জ্বালিত করিয়া ঘৃতাহুতির সঙ্গে সঙ্গে জলদগম্ভীর স্বরে যে মন্ত্রধ্বনি করিতেন তাহার রচয়িতা শুধু যে ঋষিগণ ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের কন্যা, জায়া, ভগ্নীরাও তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিতেন। শান্ত তপোবনে ঋষি-বালকেরা যেমন অবহিত চিত্তে গুরুপাদ-মূলে বসিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন, ঋষি-কন্যারাও তেমনি করিয়া ভ্রাতার সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে একাসনে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন;—সে তপোবনের শিক্ষাক্ষেত্র শুধু যে বালককণ্ঠে

মুখরিত হইয়া উঠিত তাহা নহে, বল্কল-বসনা শান্তিময়ী বালিকার কোমল কণ্ঠও সেখানে শুনা যাইত। পুরুষেরা সেকালে যেমন উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান লইয়া গুরুর আসনে বসিতেন, রমণীরাও তেমনি উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান লইয়া দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের মধ্যে, স্বামীপুত্রের সেবার মধ্যে, নিজের পরিবার ও সমাজকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন।

প্রাচীনকালে জীবনচরিত রচনার পদ্ধতি ছিল না, কাজেই বৈদিকযুগের কোনোও বিদুষী রমণীর ধারাবাহিক জীবনী আমরা পাই না। কেবলমাত্র তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত রচনা হইতে সামান্য একটু পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয়ে তৃপ্তি হয় না বটে, কিন্তু গৌরবের আনন্দে মন ভরিয়া উঠে।

সেই সুদূর অতীতকালে ভারতীয় রমণী-সমাজের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল তাহাও

জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু আমরা অনুমান করিতে পারি, সেই দেবীস্বরূপা ভারতলক্ষ্মীগণ নিজেদের পাতিব্রত্যে, সরলতায় তাঁহাদের আশ্রমগুলিকে কি শান্ত, সুন্দর ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তাঁহাদের আদর্শে বনের পশুও হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহাদেরই মতো নিরীহ ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের তপোবনে ভুজঙ্গেরা আতপতাপিত হইয়া শিখীর শিখাকলাপের ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া থাকিত ; হরিণ-শাবকেরা সিংহ-শাবকের সহিত সিংহীর স্তন্যপান করিত ; করভ সকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ডদ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিত।

বৈদিকযুগে কয়েকজন নারী বিদ্যাবত্তায় অত্যধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নাম আজ পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয় নাই, —না জানি আরো কত শত বিদুষী কালের বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইয়া আছেন। সেই দূর

অতীত কালেও যখন আমরা এমন বিদুষী রমণীর পরিচয় পাই যাঁহাদের কীর্ত্তিগৌরব কালের সহিত ধ্বংস হইবার নহে তখন এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেকালে ভারতীয় রমণীর সার্ব্বজনীন বিদ্যাধিকার ছিল।

বৈদিকযুগে যে সকল বিদুষীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কথিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববারাই প্রধান।

বিশ্ববারা

বিশ্ববারা অত্রি মুনির গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টাবিংশ সূক্ত ইঁহার রচিত। এই সূক্তে ছয়টি ঋক্ আছে;—ঋক্‌গুলি যেন এক-একটি মাণিক; ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবসম্পদে সেগুলি অতুলনীয়। ঋক্‌গুলির ভাবার্থ এইরূপঃ—

প্রজ্বলিত অগ্নি তেজ বিস্তার করিয়া উষার দিকে

দীপ্তি পাইতেছেন ; দেবার্চ্চনারতা ঘৃতপাত্রসংযুক্তা বিশ্ববারা তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

হে অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য বিস্তার কর, এবং হব্যদাতার মঙ্গলবিধানের জন্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হও।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর, আমাদের শত্রুকে শাসন কর, এবং আমাদের দাম্পত্য-প্রেম নিবিড়তর করিয়া তোল।

হে দীপ্তিশালী! তোমার দীপ্তিকে আমি পূজা করি ; তুমি যজ্ঞে প্রজ্বলিত থাক।

হে ঔজ্জ্বল্যশালী! ভক্তগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ; যজ্ঞক্ষেত্রে দেবসকলকে তুমি আরাধনা কর।

হে ভক্তগণ! যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর, এবং দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থ তাঁহাকে বরণ কর।

ইন্দ্রমাতৃগণ

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের পাঁচটি ঋক্ ইন্দ্রমাতৃগণ দ্বারা প্রণীত। ইন্দ্রঋষির পিতা বহুবিবাহ করেন। তাঁহার যে পত্নীগণ একত্রে মিলিয়া ঐ ঋক্গুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইন্দ্রমাতৃগণ নামে প্রসিদ্ধ;—ইঁহারা কশ্যপ ঋষির ঔরসে এবং অদিতি দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের একজনের নাম দেবযানি। সপত্নীরা পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ ভুলিয়া একমন হইয়া একসঙ্গে মন্ত্ররচনা করিতেছেন; এই সপত্নীর মিলন দৃশ্য আমাদের চক্ষে বড় মধুর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ইন্দ্রমাতৃগণ ইন্দ্রদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন :—

"হে ইন্দ্র! যে তেজে শত্রুকে জয় করা যায় সেই তেজ তোমাতে আছে বলিয়া তোমাকে আমরা

পূজা করি। তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ, আকাশকে বিস্তার করিয়াছ, নিজ ক্ষমতাবলে স্বর্গকে সমুন্নত করিয়া দিয়াছ; সূর্য্য তোমার সহচর, তুমি তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আছ; সেইজন্য তোমাকে আমরা পূজা করি।"

বাক্

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটি মন্ত্র রচনা করেন—এই মন্ত্রগুলি দেবীসূক্ত নামে প্রচলিত। আমাদের দেশে যে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে তাহার পূর্ব্বে এই দেবীসূক্ত পাঠের বিধি আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্যপ্রকরণ বাক্-প্রণীত এই আটটি মন্ত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত। চণ্ডীমাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌দেবীর মাহাত্ম্য সমগ্র ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত ঘোষিত হইতেছে।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া

জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে বাক্‌দেবী ঐ অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রটি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে মতের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্য বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন সে মত একেবারে তাঁহার নিজস্ব বলা যায় না, বাক্‌দেবীই তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্রী। শঙ্করাচার্য্যের মহত্ত্বের জন্য আমরা তাঁহাকে যে গৌরব প্রদান করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশ বাক্‌দেবীরই প্রাপ্য।

বাক্ তাঁহার স্বরচিত মন্ত্রে বলিতেছেন :—

"আমি রুদ্র, বসু এই সকলের আত্মার স্বরূপে বিচরণ করি। আমিই উভয় মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি। আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, আমাতে ভূরি ভূরি প্রাণী প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জীব যে দর্শন করে, প্রাণধারণ করে, অন্নাহার করে, তাহা আমাদ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমিই দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমিই সমস্ত কামনা করিয়া থাকি। আমি লোককে স্রষ্টা, ঋষি বা

বুদ্ধিশালী করিতে পারি। স্তোত্রদেষ্টা ও হিংসকের বধের জন্য আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা সংযোগ করিয়াছিলাম। আমিই ভক্তজনের উপকারার্থ বিপক্ষ পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। আমি স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশকে আমি উৎপাদন করি। বায়ু যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চারিত হয় সেইরূপ সমস্ত ভুবনের প্রসবকর্ত্রী আমি স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করি। আমার স্বীয় মাহাত্ম্যবলে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে।"

অপালা

অপালাও বিশ্ববারার ন্যায় অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জীবন বড় দুঃখময়। ইনি ত্বক রোগে আক্রান্ত হন বলিয়া স্বামী ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। স্বামী-পরিত্যক্তা নারী সারাজীবন পিতৃ-তপোবনে ঈশ্বর-আরাধনায় কাটাইয়াছিলেন।

কথিত আছে, অপালার পিতার শস্যক্ষেত্র তেমন উর্ব্বর ছিল না, অপালা ইন্দ্রদেবের আরাধনা করিয়া বরলাভ দ্বারা পিতার অনুর্ব্বর ক্ষেত্র শস্যশালী করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি বড়ই পিতৃভক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের আটটি ঋক্ অপালা রচনা করিয়াছিলেন।

লোপামুদ্রা

বিদর্ভ রাজার কন্যা লোপামুদ্রা অগস্ত্য মুনির পত্নী ছিলেন। অগস্ত্য মুনি পিতৃগণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বংশরক্ষার জন্য লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করেন।

বিন্ধ্যাচল যখন আকাশস্পর্শী দেহবিস্তার দ্বারা সূর্য্যদেবের পথরোধ করিয়া তাঁহার রথ অচল করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় এই অগস্ত্য ঋষি এক কৌশলে তাহা

নিবারণ করেন। দেবগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মুনিপ্রবর বিন্ধ্যাচলসকাশে একদিন উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্যাচল, ঋষিকে অতিথি দেখিয়া, সসম্ভ্রমে নিজের উন্নত মস্তক তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত করিলেন; ঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আজ্ঞা করিলেন—"বৎস! যে পর্য্যন্ত না আবার আমি ফিরিয়া আসি তুমি আর মাথা তুলিও না।"

অগস্ত্য ঋষি সেই যে গেলেন—আর ফিরিলেন না; বিন্ধ্যাচলও ঋষির কথা অমান্য করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতে পারিলেন না। সেই হইতে আমাদের দেশে 'অগস্ত্য-যাত্রা' বলিয়া একটা কথা চলিত হইয়া গিয়াছে। মাসের প্রথম দিন কোথাও যাইলে অগস্ত্য-যাত্রা হয়—সে দিন যাত্রা করিলে অগস্ত্যের মতো আর ফিরিয়া আসা হয় না।

লোপামুদ্রার চরিত্রটি বড় সুন্দর। এক

দিকে বিদ্যার গৌরবে যেমন তিনি মহীয়সী, অপর দিকে তেমনি পাতিব্রত্যের আদর্শ-স্থানীয়া। তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনু-গামিনী ছিলেন। স্বামী আহার করিলে তিনি আহার করিতেন; স্বামী নিদ্রা গেলে তিনি নিদ্রা যাইতেন এবং স্বামীর গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই তিনি গাত্রোত্থান করিতেন। পতিকে তিনি একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞানের বিষয় করিয়া ছিলেন। অগস্ত্য যদি কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, লোপামুদ্রা তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না, স্বামীর মনো-রঞ্জনের জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব থাকিতেন; —স্বামীর আজ্ঞা ব্যতিরেকে তিনি কোনো কর্ম্মই করিতেন না।

তাঁহার মতো সুনিপুণ সুগৃহিনী বোধ করি ভারতে আর কেহ ছিলেন না। দেবতা, অতিথি ও গো-সেবায় তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হইতেন না।

লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ সঙ্কলন করেন। এই ঋকে লোপামুদ্রা স্বামীকে বলিতেছেন—"হে প্রভু, সারাজীবন আপনার সেবায় কাটাইয়া এখন আমি শ্রান্ত; এখন আমি বৃদ্ধা; দেহ আমার জরা-জীর্ণ; তবুও আপনার সেবাই আমার জীবনের আনন্দ ও তাহাই আমার পরম তপস্যা। আপনিই আমার একমাত্র গতি। হে প্রভু! আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ যেন চিরদিন অটল থাকে।"

অদিতি

ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্ অদিতিকর্তৃক বিরচিত। অদিতি ইন্দ্রদেবের মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঋষি বামদেব একসময়ে নিজ মাতাকে ক্লেশপ্রদান করিয়াছিলেন। বামদেব-জননী

পুত্রকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া অদিতি ও ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হন। কথিত আছে, অদিতি দেবী কয়েকটী মন্ত্র রচনা করিয়া বামদেবের অবাধ্যতা দমন করেন।

অদিতি-প্রণীত শ্লোকগুলি কবিত্ব-সম্পাদে উজ্জ্বল। তিনি একটি শ্লোকে বলিতেছেন—"জলবতী নদীগণ অ-ল-লা এইরূপ হর্ষসূচক শব্দ করিয়া গমন করিতেছে। হে ঋষি! তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে উহারা কি বলিতেছে।"

পুরাণে কথিত আছে, অদিতি, ভগবান কশ্যপের পত্নী ও ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতা। ইঁহার সপত্নী দিতির বংশধর দৈত্যগণ, কোনো সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে প্রহ্লাদের পৌত্র বিরোচননন্দন বলি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হন।

ইহাতে দেবমাতা অদিতি অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রতীকার মানসে স্বামীর শরণাপন্ন হন। ভগবান কশ্যপ তাঁহাকে কঠোর পয়োব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলেন। তদনুসারে অদিতি একাগ্রচিত্তে ব্রত সম্পন্ন করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়ন সময়ে বামনরূপী ভগবান্ ব্রতভিক্ষার জন্য বলির নিকট গমন করেন। বলি তাঁহার প্রার্থনা কি জানিতে চাহিলে, বামন ত্রিপাদ মাত্র ভূমি যাচ্ঞা করেন। দাতা তাঁহার এই সামান্য প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে ভগবান স্বীয় খর্ব্বদেহ বিশালরূপে বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার তিনটি চরণ। একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ও শরীর দ্বারা চন্দ্রসূর্য্য-তারাগণসহ আকাশ আবৃত হইল। তৃতীয় পদের জন্য কোনো স্থানই অবশিষ্ট রহিল না। বলি তখন বিপদে পড়িলেন, স্বর্গ মর্ত্ত্য সব

বামন অধিকার করিয়া লইয়াছেন, তিনি ত্রিপাদ ভূমি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু মাত্র দুই পদের ভূমি দান করিয়াছেন, এখনো তৃতীয় পদ বাকি, আর তো কিছু অবশিষ্ট নাই, এ তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান দিবেন কোথায়? বুঝিলেন, ভগবান ছলনা করিতেছেন, নিজের মাথাটি নত করিয়া তিনি বলিলেন—"প্রভু! আমার মাথা আছে আপনার চরণ স্থাপন করুন।"

বলি স্বর্গ মর্ত্ত্য দান করিয়াছেন, এই দুই স্থানে তাঁহার থাকিবার অধিকার রহিল না, কাজেই তাঁহাকে পাতালে প্রবেশ করিতে হইল। দেবতারা স্বর্গরাজ্য লাভ করিলেন।

যমী

ইনি ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও একাদশ ঋক্‌গুলি এবং ১৫৪ সূক্তের পাঁচটি ঋক্

প্রণয়ন করেন। আমাদের ধারণায় যমরাজ ভীষণ, ভয়ঙ্কর ; কিন্তু যমী এই সকল ঋকে যমরাজকে পাপীর দণ্ডবিধাতা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই ; বরঞ্চ বলিয়াছেন, যম স্বর্গ-সুখদাতা। ১৫৪ সূক্তের ঋকৃগুলি এইরূপ :—

"কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়, কেহ কেহ ঘৃত সেবন করে, যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত ! তুমি তাহাদের নিকট গমন কর।

"যাঁহারা তপস্যাবলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন, যাঁহারা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, হে প্রেত ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন কর।

"যাঁহারা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন কিংবা যাঁহারা সহস্র দক্ষিণা দান করেন, হে প্রেত। তুমি তাঁহাদের নিকট গমন কর।

"যে সকল পূর্ব্বতন ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুণ্যবান হইয়াছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছেন,

যাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন, হে যম! এই প্রেত তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুক।

"যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্রপ্রকার সৎকর্ম্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহারা সূর্য্যকে রক্ষা করেন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন, হে যম! এই প্রেত এই সকল ঋষিদের নিকট গমন করুক।"

শশ্বতী

অঙ্গিরার কন্যা, আসঙ্গ নামক রাজার স্ত্রী শশ্বতী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ৩৪ সংখ্যক মন্ত্রটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শশ্বতীর স্বামী আসঙ্গ একদা দেবশাপে অঙ্গহীন হন, শশ্বতী কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বামীকে আরোগ্য করেন। তাঁহার প্রণীত উপরোক্ত মন্ত্রটিতে তিনি স্বামীর স্তব করিয়াছেন।

উর্ব্বশী

উর্ব্বশী অপ্সরা-কন্যা। ইনি ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের সাতটি ঋক্ প্রণয়ন করেন। ঐ সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরুরবার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। পুরুরবা ও অপ্সরা উর্ব্বশী একত্রে কিছুকাল বাস করিবার পর যখন তাঁহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ হইতেছে সেই সময়কার কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

পুরুরবা বলিতেছেন—"পত্নি! তুমি বড় নিষ্ঠুর! এত শীঘ্র আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইও না, তোমার সহিত প্রেমালাপ করিবার একটু অবসর দাও, মনের কথা যদি এখন বলিতে না পারি তবে চিরদিন অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।"

উর্ব্বশী উত্তর দিতেছেন—"পুরুরবা! তুমি আপন গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি উষার মত

তোমার কাছে আসিয়াছিলাম ; বায়ুকে যেমন ধরা যায় না আমাকেও তেমনি ধরিতে পারিবে না—আমার সহিত প্রেমালাপ করিয়া কি হইবে ?”

পুরুরবা।—“তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ বাহির হয় না, যুদ্ধ জয় করিয়া আমি গাভী আনিতে পারি না, রাজ্যে আমার বীর নাই, রাজ্যের শোভা গিয়াছে, আমার সৈন্যগণ আর হুঙ্কার দিয়া উঠে না।”

পুরুরবার অসংখ্য কাতরোক্তিতে উর্ব্বশী যখন কর্ণপাত করিলেন না, তখন পুরুরবা বলিতেছেন—“তবে পুরুরবা আজ পতিত হউক ; সে যেন আর কখন না উঠে—সে যেন বহুদূরে দূর হইয়া যায়, সে যেন নিঃঋতির অঙ্কে শয়ন করে, বলবান বৃকগণ যেন তাহাকে ভক্ষণ করে।”

উর্ব্বশী।—“হে পুরুরবা! এরূপে মৃত্যু-কামনা করিও না, উচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দ্দান্ত

বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। রমণীর প্রণয় স্থায়ী নয়। নারীর হৃদয় আর বৃকের হৃদয়—দুইই এক প্রকার। হে ইলাপুত্র পুরুরবা! দেবতাসকল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—তুমি মৃত্যুজয়ী হও।"

পুরুরবা ও উর্ব্বশী সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প আছে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে পুরুরবার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। পুরুরবা চন্দ্রতনয় বুধের পুত্র। ইনি যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ক্ষমাশীল ও সত্যপরায়ণ লোক তৎকালে পৃথিবীতে কেহ ছিল না। বেদবিহিত ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি বিপুল যশোলাভ করিয়াছিলেন। পুরুরবার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া উর্ব্বশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু বিবাহকালে পুরুরবাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হইতে হয় যে, কদাচ তিনি বিবস্ত্রভাবে তাঁহাকে দেখা দিবেন না—আত্মসংযম বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে;—পত্নীর শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বদা দুইটি মেষ বদ্ধ থাকিবে, আর দিবসে একবারমাত্র ঘৃত পান করিয়া তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে হইবে। এই নিয়মের কোনোরূপ ব্যতিক্রম হইলেই উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গন্ধর্ব্বলোকে প্রস্থান করিবেন।

বলা বাহুল্য, মহামতি পুরুরবা এই সকল কঠোর ব্রত পালন করিয়া উনষাট বৎসর কাল সেই বিদুষী পত্নীর সহিত একান্ত সংযমে বাস করিয়াছিলেন। এদিকে গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবসু উর্ব্বশীকে শাপমুক্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদা রাত্রিকালে তিনি এই রমণীর শয্যাপার্শ্ব হইতে মেষযুগলকে অপহরণ করেন। পত্নীর অনুরোধে পুরুরবা শয্যাত্যাগ করিয়া বিবস্ত্র অবস্থাতেই তাহাদের উদ্ধার-

সাধনে ধাবিত হন। এমন সময়, গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুতের আলোকে উর্ব্বশী স্বামীকে বিবসন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই তিরোহিত হন। পুরুরবা পত্নীশোকে একান্ত কাতর হইয়া বহুস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করেন। পরিশেষে কুরু-ক্ষেত্রের প্লক্ষ তীর্থে উভয়ের দেখা হয়। উর্ব্বশী, পুরুরবাকে প্রয়াগ তীর্থে যাইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বলেন, এবং সম্বৎসর পরে আর একদিন মিলন হইবে, তাহাও বলেন। পুরুরবা তাঁহার উপদেশ মতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং ফলস্বরূপ গন্ধর্ব্বলোক গমনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে, পুরুরবা প্রয়াগ তীর্থে প্রতিষ্ঠানপুরীতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন এবং উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

ঘোষা

ইনি কক্ষীবাণের কন্যা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্ত ইঁহার দ্বারা সঙ্কলিত। এই সূক্তে ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদিগের যে বিশ্বসঞ্চারী রথ আছে আমরা প্রতিদিনই তাহার নাম গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি। আপনি আমাদিগকে সুমধুর বাক্যবিন্যাসের প্রবৃত্তি দান করুন, তাহা দ্বারাই আমরা আপনাকে বন্দনা করি। আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের শুভকর্ম্ম সুনিষ্পন্ন হউক—আপনারা আমাদের সুবুদ্ধি দান করুন। যজ্ঞে সোমরস যেরূপ আনন্দ দান করে আমরা যেন লোকের সেইরূপ আনন্দদায়ী হই।

"একটি অবিবাহিত কন্যা পিত্রালয়ে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইতেছিল, আপনারাই অনুগ্রহ করিয়া তাহার বর আনিয়া দিলেন। যাঁহারা জরাজীর্ণ, রুগ্ন, পঙ্গু, অন্ধ, আপনারাই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ। আপনারাই জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে যৌবন দান করিয়াছেন; তুগ্র-তনয়কে জলোপরি বহন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিয়া

দিয়াছেন। আপনাদের সৎকার্য্যের ইয়ত্তা নাই। সেই জন্য আমি আপনাদেরই আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আমি আপনাদের বন্দনা করিতেছি—আহ্বান করিতেছি. আমার আহ্বান কর্ণগোচর করুন। পিতা পুত্রকে যেরূপ শিক্ষাদান করে, আপনারা আমাকে সেইরূপ শিক্ষা দান করুন। আমি জ্ঞানবুদ্ধিহীন—আমার যেন দুর্বুদ্ধি কখনো না ঘটে।

"শুন্ধ্যুবনাম্নী পুরুমিত্ররাজনন্দিনীকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া আপনারা বিমদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন; বধ্রীমতী প্রসববেদনায় কাতর হইলে আপনারাই তাঁহার যন্ত্রণা দূর করিয়াছিলেন. জরাজীর্ণ কলিকে আপনারা নব-যৌবন দান করিয়াছিলেন; বিপল্লানাম্নী ছিন্নপদা নারীকে চলৎশক্তি দান করিয়াছিলেন; শত্রুগণ যখন রেভককে মৃতপ্রায় করিয়া এক গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আপনারাই তাঁহার প্রাণদান করিয়াছিলেন; অত্রি মুনি যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন, তখন অগ্নির তেজ আপনারাই হরণ করিয়াছিলেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের নাম গ্রহণে মহা পুণ্য। আপনারা যে পথে গমন করেন সেই পথের চতুর্দ্দিকে সকলের কণ্ঠ হইতে আপনাদের

বন্দনাগান উত্থিত হয়। ঋভু নামক দেবগণ দ্বারা আপনাদের জন্য যে রথ নির্ম্মিত হইয়াছে, যে রথ আকাশমার্গে উত্থিত হইলে আকাশ-কন্যা উষাদেবীর আবির্ভাব হয় এবং সূর্য্যদেব হইতে দিন ও রজনী উৎপন্ন হয়, মন অপেক্ষাও অতি-বেগশালী সেই রথে আরোহণ করিয়া আপনারা আগমন করুন। ঐ রথে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে গমন করুন, শযু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধা ধেনুকে পুনরায় দুগ্ধবতী করিয়া দিন।

"ভৃগুসন্তানগণ যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে, আমিও আপনাদের জন্য সেইরূপ এই মন্ত্র রচনা করিলাম। বিবাহ সময়ে পিতা যেমন কন্যাকে অলঙ্কারে ভূষিত করেন, আমিও সেইরূপ এই মন্ত্রগুলিকে আপনাদের প্রশংসা দ্বারা অলঙ্কৃত করিলাম। হে অন্নধনশালিন অশ্বিদ্বয়, আপনারা আমার প্রতি কৃপাবর্ষণ করুন;— আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হউক। আপনারা আমাদের কল্যাণ-বিধাতা—অতএব আপনারা আমার রক্ষক হউন;—আমি যেন পতিগৃহে গমন করিয়া পতির প্রিয়পাত্রী হইতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সূর্য্যা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি সূর্য্যা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই সূক্তগুলি নবপরিণীত বরবধূর প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদে পূর্ণ। সেগুলির ভাবার্থ এই :—

"সূর্য্যার বিবাহ-সময়ে রৈভী নাম্নী ঋক্গুলি সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল। নরাশংসী নাম্নী ঋক্গুলি তাহার দাসী হইয়াছিল, তাহার মনোহর বসনখানি সামগান দ্বারা পবিত্র ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার ধর্ম্মজীবনই তাহার বিবাহের উপঢৌকন ছিল। সুপ্রশস্ত মনই তাহার পতিগৃহগমনের যানস্বরূপ হইয়াছিল;—অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধাচ্ছাদনস্বরূপ হইয়াছিল।

"আমাদের মিত্রগণ বিবাহের পাত্রী অন্বেষণে যে পথে গমন করেন, সে পথ নিরাপদ হউক। হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! পতি-পত্নীর মিলন যেন অক্ষয় হয়।

"এই কন্যারূপ পবিত্র পুষ্পটিকে পিতৃকুলরূপ বৃক্ষ হইতে তুলিয়া পতির হস্তে গ্রহিত করিয়া দিলাম; হে ইন্দ্র! এই কন্যা যেন পতিগৃহে সৌভাগ্যবতী হয়।

"হে কন্যা! পুষা (দেবতা) তোমার হস্ত ধারণ

করিয়া পিতৃগৃহ হইতে তোমাকে পতিগৃহে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাউন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে তাঁহাদের রথে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাউন। তুমি পতিগৃহে প্রশংসনীয়া গৃহকর্ত্রী হও।

"যাহারা শত্রুতাচরণের জন্য এই দম্পতীর নিকট আসিবে তাহারা বিনষ্ট হউক। এই দম্পতী পুণ্যের দ্বারা বিপদকে দূরীভূত করুক—ইঁহাদের নিকট হইতে শত্রুগণ পলায়ন করুক।

"এই নবপরিণীতা বধূ অতি সুলক্ষণা। তোমরা সকলে মিলিয়া এস, এই বধূকে দেখ। এই বধূ সৌভাগ্যবতী হউন, স্বামীর প্রিয় হউন—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

"হে দম্পতি, তোমরা দুজনে সদা একত্রে থাকিও; —তোমাদের মিলন যেন কখনো ভঙ্গ না হয়।

"প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে আমাদের পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হউক। অর্য্যমা (দেবতা) আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ, তুমি কল্যাণভাগিনী হইয়া চিরকাল পতিগৃহে অবস্থিতি কর। দাস দাসী, পশু প্রভৃতির প্রতি সদয় ব্যবহার রাখিও—তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিও।

"হে বধূ, তোমার নেত্রদ্বয় যেন দোষশূন্য হয়। তুমি পতির কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মন যেন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। তোমার দেহ যেন লাবণ্যময় হয়। দেবতাদের প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে।

"ইন্দ্রাদিদেবগণ পতি ও পত্নীর হৃদয় এক করিয়া দিন; বায়ু, ধাতা এবং বাগ্দেবী তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে সম্মিলিত করিয়া দিন—এই প্রার্থনা।"

নবপরিণীত বরবধূর এই আশীর্ব্বাদভিক্ষা ও তাঁহাদের প্রাণের প্রার্থনা সেই কোন্ সুদূর অতীত যুগে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, এখনও দিকে দিকে দিনে দিনে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিতেছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত রমণীগণ ব্যতীত ঋগ্বেদে আরো অনেক বিদুষীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তটি বৃহস্পতির ভার্য্যা জুহু নাম্নী আর্য্যমহিলা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই সূক্তে সাতটি মন্ত্র আছে।

দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তটি ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক বিরচিত। এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে।

দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তটি শচী কর্তৃক প্রণীত। ইহাতেও ছয়টি মন্ত্র আছে।

গোধা নাম্নী আর্য্যমহিলা দশম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কর্তৃক ঋগ্বেদের পাঁচটি মন্ত্র সঙ্কলিত হয়। এই মন্ত্রে যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

রোমশা ভাবয়ব্য রাজার মহিষী ছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋকৃটি ইনি প্রণয়ন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম স্বনয়। স্বনয় একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন।

প্রবহমান কালস্রোতের সহিত ভারতে হিন্দুসভ্যতার উন্নতির গতি বেগবতী হইয়া উঠিয়াছিল। যে স্রোতের প্রারম্ভে আমরা রমণীকে বিদুষী দেখিয়াছি, সে স্রোত যখন উচ্ছ্বাসময়ী, তরঙ্গময়ী তখনও সেই রমণী জ্ঞানে বুদ্ধিতে গরীয়সী হইয়া আমাদের সম্মুখীন—

হইতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যখন দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই পর্য্যায়ে আমরা জনকয়েক রমণীরও সন্ধান পাই। শক্তিমান পুরুষ, অবলা স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাসম্বন্ধে এখানেও পরাজিত করিয়া উর্দ্ধাসন গ্রহণ করিতে পারেন নাই—রমণীও সমান আগ্রহে সমান উৎসাহে, সমভাবে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই যুগেই আমরা মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত রমণীগণের পরিচয় পাই।

মৈত্রেয়ী

প্রথমে মৈত্রেয়ীর কথা বলি। মৈত্রেয়ী একজন বিখ্যাত বিদুষী ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইঁহার বিদ্যাবত্তার কথা জানিতে পারা যায়। ইনি মিত্রের কন্যা। মিত্রও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আপনার কন্যাটিকে অতি শৈশব হইতেই শিক্ষিতা

করিয়া তুলিয়াছিলেন ; এবং মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের অনেক অংশ মৈত্রেয়ীর জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি যে-সকল জটিল তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য হইতে উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—"মৈত্রেয়ী, আমি গৃহস্থ-আশ্রম হইতে উৎকৃষ্ট সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তজ্জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করি। আমার দ্বিতীয় ভার্য্যা কাত্যায়নীর সহিত তোমার ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিই, কি বল ?"

স্বামীর মুখে সম্পত্তি-বিভাগের কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"বিবিধ-রত্নপরিপূর্ণা এই পৃথিবী যদি আমার

লাভ হয় তাহাতে কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? আমি কি বিত্তসাধ্য কার্য্যদ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"না; এই বিত্তদ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায় না। বিবিধ উপকরণ দ্বারা যেমন সুখে জীবন ধারণ হয়, সেইরূপ বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা জীবন সুখে অতিবাহিত করা যায় মাত্র।"

তখন মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং—যার দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ না হইবে সেই বিত্ত লইয়া আমি কি করিব? আমার তাহা প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে আপনি যাহা মোক্ষ সাধন বলিয়া জানেন আমাকে তার কথাই বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য তখন তাঁহাকে মোক্ষসাধন বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। মৈত্রেয়ী এই উপদেশের প্রসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন

করিয়া নিজের সংশয় দূর করিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি যে কিরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী ছিলেন তাহা তাঁহার এই সকল প্রশ্ন-বচন হইতে অনুমান করা যায়। শুধু গৃহস্থালীর কাজে নহে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ধর্ম্মপ্রাণতায় তিনি তাঁহার মহর্ষি স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গী এবং গৃহিণী ছিলেন।

গার্গী

মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী আর একজন ছিলেন; তিনি মৈত্রেয়ীরই আত্মীয়া;—তাঁহার নাম গার্গী; তিনি বচক্নু মুনির কন্যা।

নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য রাজর্ষি জনক বিখ্যাত পণ্ডিত-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করিতেন। ঐ সভাতে সেই সকল প্রশ্নের আলোচনা হইত। এ আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু পুরুষরাই যে স্থান পাইতেন তাহা

নহে ; অনেক স্ত্রীরত্নও রাজর্ষির সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিতেন। তাঁহারা পুরুষের সহিত মিলিয়া নানা কঠিন বিষয়ের আলোচনায় সহযোগিতা করিতেন।

এক সময়ে রাজর্ষি এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে কুরুদেশীয় ও পাঞ্চালদেশীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে অল্পবয়স্কা একসহস্র গাভী ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য রাজা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন ; প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গে দশ-দশ পাদ সুবর্ণও রক্ষিত হইয়াছিল। রাজা উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলে—"আপনারা সকলেই ব্রহ্মিষ্ঠ জানি ; কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠতম, তিনি এই সকল গাভী নিজ গৃহে প্রেরণ করুন।"

রাজার কথায় ব্রাহ্মণমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ;—গাভী গ্রহণ করিবার কাহারো সাহস দেখা গেল না ; কে নিজেকে

ব্রহ্মিষ্ঠতম বলিয়া স্পর্দ্ধা দেখাইবেন ? সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। যখন কেহই গাভী গ্রহণ করিলেন না তখন ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার এক শিষ্যকে ঐ সকল গাভী লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। শিষ্য ঐ গাভীগুলি গুরুগৃহে লইয়া গেলে সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা যাজ্ঞ-বল্ক্যের ঔদ্ধত্যে কুপিত হইয়া উঠিলেন। জনকের পুরোহিত অশ্বল তীব্রকণ্ঠে বলিলেন —"তুমিই এই সভার মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠতম ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আপনারা সকলেই ব্রহ্মিষ্ঠ ; আমি আপনাদের নমস্কার করি। ঐ গাভীগুলি গ্রহণ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল তাই আমি গ্রহণ করিয়াছি।"

অশ্বল ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানী ছিলেন ; যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহারে তাঁহার অভিমান স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ; দেখা যাক কত-বড় ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি ! যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বলের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া তাঁহারে

মুখ বন্ধ করিলেন। অশ্বল থামিলে আর্ত্তভাগ ও কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা পরাজিত হইয়া বিরত হইলে আর-কাহারো সাহস দেখা গেল না; তখন গার্গী উঠিলেন। সকলে সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। অশ্বলের মতো ব্রহ্মিষ্ঠ, আর্ত্তভাগের মতো পণ্ডিত যে-যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হার মানিয়া গেল তাঁহাকে সভার মধ্যে সম্মুখসমরে ডাক দিতে রমণী-হৃদয় এতটুকু কাঁপিল না!

গার্গীর সাহস দেখিয়া সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। গার্গী তখন যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি একটি পর একটি করিয়া তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সব প্রশ্নগঠনের চাতুর্য্য দেখিয়া সভাসুদ্ধ সকলে অবাক হইয়া গেলেন। এবং গার্গীর পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দেবহুতি

আর একজন বিদুষী রমণীর নাম দেবহুতি। ইনি রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। ইঁহার মাতার নাম শতরূপা। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই প্রসিদ্ধ রাজা দেবহুতির ভ্রাতা ছিলেন। তৎকালে কর্দ্দম নামে এক ঋষি যেমন জ্ঞানে তেমনি বিদ্যা-বুদ্ধিতে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। দেবহুতি তাঁহাকেই স্বামিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হন। কেবলমাত্র জ্ঞান ও বিদ্যালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই দেবহুতি রাজকন্যা হইয়াও এই দরিদ্র ঋষিকে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন ;—শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ এতই প্রবল ছিল।

রাজা স্বায়ম্ভুব বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া কর্দ্দমের নিকট উপস্থিত হইলেন, কর্দ্দম তখন ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের উদ্যোগ

করিতেছিলেন, দেবহুতির মত রমণীকে পাইয়া তিনি কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

দেবহুতি পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত বনবাসিনী হইলেন। দিন দিন তাঁহার বিদ্যালাভের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী সে স্পৃহা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডারে যাহা-কিছু ছিল নিঃশেষ করিয়া পত্নীকে দান করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন অরণ্যে স্বামীর পাদমূলে বসিয়া দেবহুতি ব্রহ্মচারিণীর মত একাগ্রমনে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসনয়নাগ্রে জগতের কত সমস্যা চিত্রিত হইয়া উঠিতে লাগিল;—চিন্তাশীলা রমণী তাহা পূরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দেবহুতির গর্ভে নয়টি কন্যা জন্ম লাভ করেন; তন্মধ্যে অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিশেষ বিখ্যাত। "অরুন্ধতী বশিষ্ঠঋষির পত্নী ছিলেন;

তিনি এমন পতিব্রতা ছিলেন যে তাঁহার পাতিব্রত্য চিরদিনের আদর্শ হইয়া আছে! বিবাহমন্ত্রে আছে যে বিবাহকালে কন্যা বলিবেন, —"অরুন্ধতী! আমি তোমার ন্যায় যেন স্বীয় স্বামীতে অনুরক্তা থাকি, এই আমার প্রার্থনা।" অনসূয়া অত্রি ঋষিকে বরণ করেন; তিনিও ভগ্নী অরুন্ধতীর ন্যায় গুণবতী ছিলেন।

সাঙ্খ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলমুনিকেও এই দেবহুতি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। কপিলই দর্শনশাস্ত্রের একরূপ জন্মদাতা। তিনিই জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা লইয়া মানবের অন্ধকার-আচ্ছন্ন মনের নিগূঢ় তথ্য অন্বেষণ আরম্ভ করেন, সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে মানবের অন্তর বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখেন; তিনিই প্রথম আলোচনা করেন কোথায় দুঃখ ও শান্তির বীজ রহিয়াছে; এবং তিনিই আবিষ্কার করেন কি করিয়া সেই দুঃখের বীজ ধ্বংস করিতে পারা যায়—কি উপায়ে মানবের মুক্তি আসে।

কিন্তু এই কপিলের শিক্ষালাভের মূলে বর্ত্তমান কে? কে তাঁহার ক্ষুদ্রদৃষ্টি জগতের ব্যাপকতায় প্রসারিত করিয়া দেন—মানুষের অন্তর-অন্বেষণের বৃত্তি কে তাঁহার মধ্যে জাগাইয়া দেন? তাঁহার জননী দেবহূতি। এমন জননা না পাইলে কপিলকে আমরা এ-ভাবে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ।

দেবহূতি আপনার পুত্রটিকে আপনি শিক্ষাদান করিয়াছিলেন; কোন্ পথে কপিলের চিন্তাস্রোত প্রধাবিত হইবে তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। যে দর্শনশাস্ত্রের অমূল্য বীজ দেবহূতি জ্ঞান-আরাধনায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পুত্রের সাহায্যে ফলফুল-শোভিত বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া তুলেন।

মদালসা

দেবহূতির মত আর-একটি রমণীকে আমরা দেখিতে পাই যিনি শিক্ষাদানে নিজের পুত্রকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার নাম

মদালসা। তিনি গন্ধর্ব্বকন্যা ছিলেন; ঋতধ্বজ রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মদালসা বিদুষী, ভক্তিমতী ও জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন। বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক নামে তাঁহার চার পুত্র ছিল। পুত্রগণকে তিনি স্বয়ং শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়া বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন সংসারবিরাগী হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। কিরূপ শিক্ষা দিয়া তিনি পুত্রগণের চরিত্র উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

মদালসার জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রান্ত একদিন কয়েকজন বালকের দ্বারা প্রহৃত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মাতাকে বলিলেন,—"মা, জনকয়েক বালক আমাকে প্রহার করিয়াছে। আমি রাজপুত্র, উহারা প্রজার সন্তান; আমি এত সম্মানের পাত্র তথাপি উহারা সামান্য

লোক হইয়া আমাকে প্রহার করে—এত বড় স্পর্দ্ধা! তুমি ইহার প্রতিবিধান কর।"

মদালসা এই কথা শুনিয়া পুত্রকে বুঝাইলেন—"বৎস! তুমি শুদ্ধাত্মা। আত্মার প্রকৃতি নামদ্বারা কখনো কলুষিত হয় না। তোমার 'বিক্রান্ত' নাম বা 'রাজপুত্র' উপাধি প্রকৃত পদার্থ নহে,—কল্পিত মাত্র; অতএব রাজপুত্র বলিয়া অভিমান করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তোমার এই দৃশ্যমান শরীর পাঞ্চভৌতিক; তুমি এই দেহ নহ, তবে দেহের বিকারে ক্রন্দন করিতেছ কেন?"

মহিষীর শিক্ষার প্রভাবে তিনটি পুত্র যখন সংসারত্যাগী হইল তখন রাজা ঋতধ্বজ চিন্তিত হইয়া মদালসাকে বলিলেন, "মদালসা! তিনটি পুত্রকে ত তুমি বনবাসী করিয়াছ, এখন কনিষ্ঠ পুত্র যাহাতে তাহার ভ্রাতৃত্রয়ের পথানুসরণ না করে তাহার উপায় কর। সে যদি সন্ন্যাসী হয় তবে রাজ্যশাসন করিবে কে?"

মদালসা স্বামীর আজ্ঞায় তখন কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে রাজনীতিবিষয়ক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উপদেশগুলি পাঠ করিলে তিনি যে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ঋতধ্বজ ও মদালসা সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়।

দৈত্যদানবের উৎপাতে ঋষি গালবের তপোবিঘ্ন জন্মিতেছে,এই কথা শুনিয়া শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ, ঋষির তপোরক্ষার জন্য তদীয় আশ্রমে গমন করিলেন। একদিন গালব ঈশ্বর-আরাধনায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় এক দানব বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমার ঋতধ্বজ তাহাকে দেখিয়া শরসন্ধান করিলেন এবং নারাচের আঘাতে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শূকর প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল; ঋতধ্বজ কুবলয় নামক

অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শূকর ছুটিয়া ছুটিয়া সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া গেল, রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠে তখনও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই শূকররূপী দানব এক গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিল; ঋতধ্বজ সেখানেও তাহার অনুসরণ করিলেন।

গর্ত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অন্ধকারের মধ্যে গমন করিয়া ঋতধ্বজ অবশেষে আলোকে আসিয়া পড়িলেন; দেখিলেন ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শত শত প্রাসাদ-শোভিত ও প্রাকার-পরিবেষ্টিত এক অপূর্ব্ব পুরী! তিনি শূকরের অনুসন্ধান করিতে করিতে এক প্রাসাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে সখীগণপরিবেষ্টিতা ক্ষীণাঙ্গী এক ললনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণী ঋতধ্বজকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

সখীগণের সেবায় সেই রমণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, রাজপুত্র* তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন সখী বলিল—"ইনি গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা। ইনি একদিন পিতার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় বজ্রকেতু-দানবের পুত্র পাতালকেতু তমোময়ী মায়া বিস্তার করিয়া ইঁহাকে হরণ করে এবং ইঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় এই পুরীতে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে।"

সখী গন্ধর্ব্বকুমারীর পরিচয় প্রদান শেষ করিয়া রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে এবং কেমন করিয়াই বা এই পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন?" ঋতধ্বজ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলে, সখী পুনরায় বলিল —"তবে আপনিই আমার সখী মদালসাকে এই পাতালপুরী ও দানব পাতালকেতুর কবল হইতে রক্ষা করুন; উনি আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন;—দেবকন্যারূপা

মদালসাকে পত্নীরূপে পাইলে কে না নিজেকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিবেন? আর আপনার মত স্বামী আমার সখীরই উপযুক্ত।"

ঋতধ্বজ মদালসার পাণিগ্রহণ করিয়া পাতালপুরী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, পথে দৈত্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঋতধ্বজ একা সমস্ত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন এবং জয়লাভ করিয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ঋতধ্বজের পিতা শত্রুজিৎ এবং পুরবাসিগণ মদালসাকে মহা আনন্দে বরণ করিয়া লইলেন।

কিছুকাল পরে ঋতধ্বজ পিতার আদেশে ঋষিগণের তপোরক্ষার জন্য পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। তথায় পাতালকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তালকেতু মায়াবলে মুনিরূপ ধারণ করিয়া এক আশ্রমে অবস্থান করিতেছিল।

তালকেতু ঋতধ্বজকে দেখিয়াই তাঁহাকে ভ্রাতৃবৈরী বলিয়া চিনিতে পারিল, এবং প্রতিশোধ লইবার মানসে এক কৌশল অবলম্বন করিল। সে ঋতধ্বজের নিকটে আসিয়া বলিল—"রাজকুমার! আপনি ঋষি-কুলের তপোরক্ষায় নিযুক্ত আছেন; আমি এক অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু দক্ষিণা দিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। আপনার কণ্ঠের ঐ মণিময় হার যদি আমাকে দান করেন তাহা হইলে আমার বাসনা পুর্ণ হয়।" এই কথা শুনিয়া ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ নিজ কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া সেই ছদ্মবেশী দানবকে প্রদান করিলেন। হার পাইয়া তালকেতু বলিল—"আমি এখন জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া বরুণদেবের আরাধনা করিব, যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসি আপনি আমার আশ্রম রক্ষা করুন।"

ঋতধ্বজ তালকেতুর কথায় কোনো সন্দেহ না করিয়া সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে তালকেতু সেই হার লইয়া শত্রুজিৎ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইল এবং ঐ হার দেখাইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, দানবদিগের সহিত যুদ্ধে ঋতধ্বজ নিহত হইয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্র মদালসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর ইহজন্মে ভঙ্গ হইল না।

তালকেতু তখন যমুনাতটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"যুবরাজ! আমার যজ্ঞ শেষ হইয়াছে, এখন আপনি যথাস্থানে গমন করিতে পারেন। আমার বহুদিনের মনোরথ আপনি পূর্ণ করিলেন, আপনার মঙ্গল হউক।"

ঋতধ্বজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। মদালসা আর ইহ-সংসারে নাই—স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্রই

দেহত্যাগ করিয়াছেন—এই শোকে ঋতধ্বজ মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন এবং "মদালসা আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন, আর আমি তাঁহার বিরহে এখনও জীবিত রহিয়াছি" দিবারাত্র এইরূপ কাতর-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ঋতধ্বজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বন্ধু নাগরাজ-তনয়গণ উহার প্রতিকারের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। মদালসার সহিত যাহাতে ঋতধ্বজের পুনর্মিলন হয় তজ্জন্য তাঁহারা স্বীয় পিতা নাগরাজের নিকট বারম্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন। নাগরাজ হিমালয়ে গিয়া দুশ্চর তপস্যায় বসিলেন এবং তপস্যা দ্বারা সরস্বতী ও মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া এই বরলাভ করিলেন যে, মদালসা যে-বয়সে মরিয়াছেন ঠিক সেই বয়স লইয়া তাঁহার কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন।

মহাদেব ও সরস্বতীর বরে মদালসা যেমনটি

ছিলেন ঠিক তেমনি হইয়া নাগরাজগৃহে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাহার পর একদিন নাগরাজ ঋত-ধ্বজকে নাগপুরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মদালসার সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

আত্রেয়ী

আত্রেয়ী প্রাচীন-ভারতের অন্যতমা বিদুষী রমণী। ইনি কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে ইঁহার যেরূপ গভীর অনুরাগ ও অদম্য অধ্য-বসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

প্রাচীন বেদাধ্যাপক মহাকবি বাল্মীকিকে উপযুক্ত গুরু মনে করিয়া এই রমণী প্রথমে তাঁহার নিকট বেদবেদাঙ্গ ও উপনিষদাদি শিক্ষা করিতে গমন করেন, এবং কিছুকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে তথায় শাস্ত্রাভ্যাসও করেন;

কিন্তু যখন সীতা-দেবীর যমজতনয় লব-কুশ উক্ত মহর্ষির নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন, তখন আত্রেয়ী-দেবীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল। লবকুশের প্রতিভা এমন অদ্ভুত ছিল যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঋক, যজু ও সামবেদে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; এবং সেই সুকুমার বাল্য-বয়সেই তাঁহারা মহর্ষি-প্রণীত রামায়ণ নামক সুবৃহৎ মহাকাব্যখানি অদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই তীক্ষ্ণধী বালক দুইটিকে শিষ্যরূপে পাইয়া সম্ভবত মহর্ষিও তাঁহার অন্যান্য শিষ্য ও শিষ্যাদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া থাকিবেন; সুতরাং আত্রেয়ী তখন বাল্মীকির আশ্রমে তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার তেমন সুযোগ দেখিতে পাইলেন না। লবকুশের দীপ্তপ্রতিভার নিকট তাঁহার নিজের মানসিক

শক্তি নিতান্ত হীন বলিয়া বিবেচিত হইল ;—তাঁহাদের সঙ্গে একযোগে পাঠাভ্যাস করিতে গিয়া তিনি সমভাবে তাঁহাদের সহিত অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সুতরাং ভগ্নহৃদয়ে তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এমনি প্রবল ছিল যে, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তৎকালে অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত দক্ষিণ-ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে মহামুনি অগস্ত্যই সর্ব্বপ্রধান। আত্রেয়ী তাঁহার নিকট গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রমণীর পক্ষে তৎকালে সেই বহুযোজন দূরবর্ত্তী অগস্ত্য-আশ্রমে যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারিণীর ঐকান্তিক জ্ঞানস্পৃহা কোনো বাধা বিঘ্ন বা ক্লেশকেই গ্রাহ্য করিল না। নিঃসহায়া রমণী একাকিনী

পদব্রজে প্রবাসযাত্রা করিলেন এবং কত জনপদ, কত নদনদী অতিক্রম করিয়া বিশাল দণ্ডকারণ্য অতিবাহনপূর্ব্বক বহুদিন পরে অগস্ত্য-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

কথিত পাছে, মহর্ষি অগস্ত্য আত্রেয়ীর এই-আশ্চর্য্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা ও অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কন্যার ন্যায় স্নেহে নিজ আশ্রমে রাখিয়া বহুযত্নে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাগ্রহ অধ্যাপনায় আত্রেয়ীও নিজের অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভারতী

শঙ্করাচার্য্য যখন বিশ্বগ্রাসী বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তিনি সিন্ধু-উপকূল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকল-দেশে শিষ্যসহ গমন করিয়া আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন সেই

সময় এই কার্য্যে এক রমণীও তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন;তিনি মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতী দেবী। বলা বাহুল্য তিনি মহাবিদুষী ছিলেন।

কথিত আছে, শৈশবে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যাইত। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সের মধ্যে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক—এই ছয় দর্শন; এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ-সরস্বতী জ্ঞান করিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর ছিল বলিয়া তিনি আর একটি নাম পাইয়াছিলেন—সরসবাণী।

মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের এক সময় একটা শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। এই তর্কের সূত্রপাতে

শঙ্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করেন, যদি তিনি পরাজিত হন তাহা হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মণ্ডনমিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন; আর মণ্ডনমিশ্র প্রতিজ্ঞা করেন, যদি তিনি পরাজিত হন তাহা হইলে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। দুইজনেই মহা পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের তর্ক সামান্য ছিল না। দুই দলের দুই প্রধান পণ্ডিতের তর্ক,—এ তর্কের বিচার করে কে? এত বড় পাণ্ডিত্য কাহার?

বিচারকের সন্ধানে বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন হইল না। মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতী দেবী এই মহা সম্মানের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

তর্ক চলিতে লাগিল; ভারতী জয়মাল্য হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। সে-মাল্য কাহার গলায় অর্পণ করিবেন, কে সেই মাল্য পাইবার উপযুক্ত, ধীরভাবে তাহা বিচার

করিতে লাগিলেন। যোগ্যপাত্রেই বিচারের ভার পড়িয়াছিল। ভারতী দেবী পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন ;—তিনি যে গুরুভার পাইয়াছেন তাহার অবমাননা করিলেন না। দেখিলেন স্বামী পরাজিত হইয়াছেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে শঙ্করাচার্য্যের গলায় সেই জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

স্বামী পরাজিত হইয়াছেন দেখিয়া ভারতী বলিলেন,—"এখন আমার সহিত তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হও, আমাকে যদি জয়ী করিতে পার তবেই তুমি যথার্থ জয়ী!" রমণীর মুখে এ স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া শঙ্কর চমকিত হইলেন— কি আশ্চর্য্য! শঙ্করাচার্য্যের সহিত রমণী তর্ক করিতে চায়!

তর্ক আরম্ভ হইল। ভারতী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শঙ্কর উত্তর দিতে লাগিলেন। আবার শঙ্কর শাস্ত্রীয় সমস্যা উপস্থিত করিতে লাগিলেন, ভারতী তাহা পূরণ করিতে

লাগিলেন ;—এইরূপে দিন রাত্রি সপ্তাহ মাস ধরিয়া তর্ক চলিতে লাগিল। ভারতী কিছুতেই ক্লান্ত হন না—তিনি শঙ্করাচার্য্যকে জয় করিবার জন্য যেন পণ করিয়া বসিয়াছেন ! শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; মনে মনে ভাবিলেন অনেক পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিয়াছি কিন্তু এমন তর্ক করিতে কাহাকেও দেখি নাই।

তর্ক শেষ হইল। ভারতী কিছুতেই জয় লাভ করিতে পারিলেন না। তখন মণ্ডনমিশ্র নিজের প্রতিজ্ঞা-মত শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। ভারতী দেবীও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। শঙ্করাচার্য্য তর্কে জয়লাভ করিয়া শুধু যে মণ্ডনমিশ্রকে লাভ করিলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী ভারতীকেও পাইলেন। শঙ্কর যে মহাকার্য্যের ভার লইয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিতে ভারতীর মত রমণীরও বিশেষ আবশ্যক ছিল।

ভারতী প্রাণমন ঢালিয়া শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ভারতীকে না পাইলে, বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

লীলাবতী

জগৎসুদ্ধ লোক যাঁহার নাম জানেন এবার তাঁহার কথাই উল্লেখ করিব। তিনি লীলাবতী ;—পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। লীলাবতী অল্পবয়সে বিধবা হন। তাঁহার বিধবা হওয়া সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

লীলাবতীর পিতা ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কন্যার ভাগ্যফল গণনা করিয়া দেখিলেন যে, বিবাহের পর অল্পকালের মধ্যেই কন্যা বিধবা হইবেন। তিনি জ্যোতিষী পণ্ডিত, জ্যোতিষের নাড়ীনক্ষত্র সব জানেন, গণনা করিয়া এমন লগ্ন খুঁজিতে

লাগিলেন যে যখন বিবাহ হইলে কন্যা কিছুতেই বিধবা হইতে পারে না। সেই শুভ লগ্নটি কখন্ তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার জন্য একটি ছোট পাত্রে ছিদ্র করিয়া জলের উপর ভাসাইয়া রাখা হইল; ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিয়া যে-মুহূর্ত্তে সমস্ত পাত্রটিকে ডুবাইয়া দিবে সেই মুহূর্ত্তটিই শুভ লগ্ন। বিধাতার লিপি মানুষ কৌশলে ও বিত্তাবুদ্ধির বলে নিষ্ফল করিতে চাহিল কিন্তু সে ক্ষুদ্র চেষ্টা বিধাতার অমোঘ বিধানে ব্যর্থ হইয়া গেল।

লীলাবতী বালিকা, কাজেই কৌতূহল-পরবশ ছিলেন। তিনি পাত্র জলমগ্ন হওয়ার ব্যাপার উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছিলেন। বিবাহসজ্জায় লীলাবতী তখন সজ্জিতা;—মাথায় মুক্তার গহনা পরিয়াছেন। ঝুঁকিয়া পড়িয়া অর্দ্ধমগ্ন পাত্রটিকে যেমন দেখিতে যাইবেন, অমনি সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মাথা হইতে একটি ছোট মুক্তা

পাত্রের মধ্যে পড়িয়া জল-প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিল।

সকলেই অপেক্ষা করিতেছে পাত্রটি কখন্ জলমগ্ন হয়; কিন্তু পাত্র আর মগ্ন হয় না! অসম্ভব বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অনুসন্ধান করা হইল; তখন প্রকাশ পাইল যে, ছিদ্র বন্ধ হওয়ায় পাত্রে জল প্রবেশ করিতেছে না। যে সময় পাত্রটি জলমগ্ন হওয়া উচিত সেই শুভলগ্ন কখন্ যে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ভাস্করাচার্য্য তাহা টের পান নাই। তিনি দেখিলেন বিধিলিপি খণ্ডান যাইবে না;—তখন বিধাতার বিধান শিরোধার্য্য করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন,—কন্যাও বিধবা হইলেন।

পিতা তখন কন্যাকে আপনার কাছে রাখিয়া নিজের পাণ্ডিত্য দান করিতে লাগিলেন। লীলাবতীর বিদ্যার পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। কথিত আছে যে, তিনি এমন পণ্ডিত যে ছিলেন হিসাব করিয়া গাছের পাতার সংখ্যা

বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি সমস্ত জীবন কেবল শিক্ষাকার্য্যেই কাটাইয়াছিলেন।

খনা

শোনা যায় জ্যোতিষশাস্ত্রে খনা বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি স্বয়ং অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তাঁহার মত এত-বড় জ্যোতিষীর নাম বড় বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, খনা অনার্য্যদিগের নিকট হইতে এই জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন; আর্য্যেরা তখন এ বিদ্যা জানিতেন না। ইহা তাঁহার পক্ষে খুবই গৌরবের কথা। যাহা আমাদের মধ্যে ছিল না, তাহা আনিবার জন্য খনা যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া সত্যই অনার্য্যের দ্বারস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুধু আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য গৌরব দান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, তাঁহাকে পূজনীয়ার সম্মানও দান করিতে

হয়। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, খনা পুরুষজাতিকে পরাজিত করিয়াছেন।

খনার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আরও এক-জন জ্যোতিষশিক্ষার্থ অনার্য্যদিগের গৃহে গমন করেন; তাঁহার নাম মিহির। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন বরাহের পুত্র। রাক্ষসদিগের গৃহে এই খনা ও মিহির একত্রে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে জ্যোতিষ-বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছিলেন; দুই-জনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ! কত ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া-চাহিয়া এই দুইটি বালক-বালিকা নক্ষত্রখচিত অসীম আকাশের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছেন! কোথায় ভরণী, কোথায় কৃত্তিকা, কোথায় মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু তাহা নির্ণয়ের জন্য হয়ত কত নিশি তাঁহাদের জাগরণেই কাটিয়াছে। কোন্ কেতু,

কোন্ গ্রহ, কোন্ দিকে ছুটিতেছে তাহা অনুসরণ করিতে-করিতে কতবারই না তাঁহাদের চারিচক্ষুর দৃষ্টি অসীম আকাশের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। গগনের কোন্ প্রান্তে বসিয়া মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগণ মানবের উপর মঙ্গল ও অমঙ্গলের ধারা বর্ষণ করিতেছে, সে-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাদিগকে কতই না ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে!

ভারতবর্ষের জ্যোতিষের গৌরব আজও লুপ্ত হয় নাই, পাশ্চাত্যজগৎ এখনও তাহার গুণগান করেন;—এ সকল গৌরব খনার স্মৃতিমন্দিরে স্তূপীকৃত হইতেছে।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হয়। তখন তাঁহারা উভয়ে বরাহের ঘরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে খনার জ্ঞান যে স্বামী অপেক্ষাও বেশী ছিল, তাহার প্রমাণ ইহারা

যখন শিক্ষা শেষ করিয়া অনার্য্যদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়। বহুকাল একত্রে থাকার দরুন একটা মায়ার টানে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই এই দুজনকে শেষ-বিদায় দিবার জন্য গ্রামপ্রান্তস্থ এক নদীতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সেইখানে এক আসন্ন-প্রসবা গাভী দাঁড়াইয়াছিল। গুরু মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! যে প্রাণীটি অল্প-মুহূর্ত্তের মধ্যে সংসার-আলোকে আসিবে সেটি কোন্ বর্ণের হইবে বলিতে পার?" মিহির গণনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার গণনা-ফল ঠিক হইল না। গুরু তখন মিহিরের হাতে কতকগুলি পুঁথি দিয়া বলিলেন,—"এখনও তুমি জ্যোতিষের সব শিখিতে পার নাই, এইগুলি সঙ্গে লও, ইহার সাহায্যে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিও।"

মিহির পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন না ; গুরু তাঁহার শিক্ষায় বরাবরই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু খনার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল ;—খনার জ্যোতিষশিক্ষা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে সে-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না।

মিহির গুরুর হাত হইতে পুঁথিগুলি লইলেন, কিন্তু তাঁহার মন তখন ঠিক ছিল না, তাঁহার মনে হইতেছিল, এত দিনের এত পরিশ্রমেও যদি জ্যোতিষ-বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলাম, দূর-হউক এই সামান্য কয়খানা পুঁথিতে আমার কি হইবে! এই ভাবিয়া তিনি পুঁথিগুলি খরস্রোতা নদীর গর্ভে ফেলিয়া দিলেন। খনা অদূরে দাঁড়াইয়া তখনও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী গ্রামের চিত্রখানি শেষবার দেখিয়া লইতেছিলেন। হঠাৎ এই ঘটনা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি মিহিরের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"কি করিলে!" তখন সেই পুঁথিগুলিকে স্রোতস্বতী তরঙ্গভঙ্গ

নিজের বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। কথিত আছে, এই সঙ্গে ভূগর্ভের জ্যোতিষ-বিদ্যা ইহ-সংসার হইতে লুপ্ত হয়।

খনার শেষ-জীবন বড়ই হৃদয়বিদারক।

খনার শ্বশুর বরাহ, বিক্রমাদিত্য-সভার এক রত্ন ছিলেন। আকাশপটে সর্ব্বসমেত কতগুলি তারকা আছে এই কথা জানিবার জন্য বিক্রমাদিত্যের বড়ই আগ্রহ হয়। এই প্রশ্ন-মীমাংসার ভার মহারাজা বরাহের উপর অর্পণ করেন। কিন্তু বরাহ কোন্ বিদ্যাবলে তাহা বলিয়া দিবেন? ইহা তাঁহার জ্ঞানের অতীত ছিল।

খনা শ্বশুরের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন; প্রশ্ন করিয়া সব ব্যাপার বুঝিলেন। তখন তিনি শ্বশুরকে আশ্বস্ত হইতে বলিয়া, বলিলেন,—"আমি বলিয়া দিব।"

খনার জ্যোতিষ-বিদ্যার ফল লইয়া বরাহ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাহা

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপায়ে তুমি তারকার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।" বরাহ বরাবরই এ-বিষয়ে অজ্ঞ, কাজেই তাঁহাকে খনার নাম উল্লেখ করিতে হইল।

বিক্রমাদিত্য খনার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার সভার দশম রত্নের স্থান দান করিতে চাহিলেন।

পুত্রবধূকে রাজসভায় আসিয়া বসিতে হইবে, এ কথা শুনিয়া বরাহের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কেমন করিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে উপায় বাহির হইল। খনার জিহ্বা কাটিয়া দিলে, বাক্‌রোধ হইবে, তাহাতে রাজসভায় তিনি আর কোনো প্রয়োজনে আসিবেন না।

বরাহ পুত্রের উপর সে-ভার অর্পণ করিলেন। মিহির অস্ত্র হাতে লইয়া খনার ঘরে উপস্থিত

হইলেন। খনা প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন,—"আমার ভাগ্যফল বহুদিন পূর্ব্বে আমি গণনায় জানিয়াছি; তুমি ইতস্ততঃ করিও না; যাহা বিধিলিপি তাহা হইবেই।" এই বলিয়া তিনি আপনার জিহ্বা বাহির করিয়া দিলেন। মিহির তাহার উপর অস্ত্রচালনা করিলেন,—ঘরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল; ধমনীর শেষ-রক্তবিন্দুর সহিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর প্রাণটুকুও বাহির হইয়া গেল!

মীরাবাই

এক সময়ে চিতোরের রাজ-সিংহাসন ও কবির সিংহাসন এই দুই আসন জুড়িয়া এক রমণী বিদ্যমান ছিলেন;—তিনি মীরাবাই। তিনি চিতোর-রাজ কুম্ভের মহিষী, তাই তাঁহার সিংহাসনে স্থান, আর তাঁহার আবেগময়ী কবিতার ঝঙ্কারে চিতোর

মুখরিত সেইজন্য সেখানকার কবি-সিংহাসনেও তাঁহার অধিকার। চিতোর যে কেবল রমণীর বীরত্বগাথা বহন করিয়া নিজ গৌরব প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, তৎসঙ্গে রমণীর বিদ্যাবত্তার গৌরব-মুকুটও তাঁহার শিরে শোভমান। মীরাবাই অসাধারণ ভক্তিমতী ধার্ম্মিকা রমণী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইলেও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি তাঁহার কম ছিল না।

মীরা এক রাঠোর-সামন্তের কন্যা ছিলেন। অলোকসামান্যা রূপবতী ও সুকণ্ঠী বলিয়া বালিকা-বয়স হইতে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতি দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার রূপ দেখিবার ও গান শুনিবার জন্য তাঁহার পিত্রালয়ে নানা স্থান হইতে লোকসমাগম হইত। মীরা তাঁহাদের সকলকে রূপ-লাবণ্যে ও সঙ্গীত-মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিতেন। এই মুগ্ধ অতিথি-দিগের মধ্যে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভও একজন

ছিলেন। মীরার রূপসন্দর্শনে ও গানশ্রবণে তিনি এমন মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে রাঠোর-সামন্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল ; তিনি সেইখানে কয়েক দিবস থাকিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় হস্ত হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া মীরাকে উপহার দিয়া গেলেন—অঙ্গুরীর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মনপ্রাণ মীরার হস্তে গিয়া উঠিল।

কুম্ভ চিতোরে ফিরিয়া গেলেন, তাহার পরেই দুত বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া রাঠোর সামন্তের গৃহে উপস্থিত হইল। কুলশীলমানে কুম্ভ মীরার উপযুক্ত ;—যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল।

মীরা শৈশবকাল হইতে অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন ;—সংসারের ভোগবিলাসের লালসা তাঁহার ছিল না। পিত্রালয়ে তিনি প্রায় সমস্ত দিন সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভগবানের নাম-গান করিয়াই কাটাইতেন।

কিন্তু স্বামীগৃহের মর্য্যাদা তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদের প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল; ওথাকার ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রতি পদে সংসারের দিকে আকৃষ্ট করিতে চাহিল,—মুক্ত প্রাঙ্গণে জনসাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীতধারা বর্ষণ করিবার সুযোগ দিল না;—প্রাসাদ-প্রাচীর যেন তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া বসিল। ইহাতে মীরা দিন-দিন ম্লান ও শীর্ণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিস্রোত সঙ্গীত-পথে প্রবাহিত হইতে না পাইয়া অপর পন্থা আবিষ্কার করিল।

মীরা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন। এ সমস্ত কবিতা তাঁহার উপাস্য দেবতা 'রঞ্ছোড়' দেবের উদ্দেশে রচিত। তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভা এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এখন হইতে তাহার স্ফুরণ আরম্ভ হইল। তাঁহার আবেগময়ী রচনা যখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইল, তখন

চতুর্দ্দিক প্রশংসা-বাণীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; —তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

ক্রমে মীরার কবিতা স্বরলয়-সংযোগে রাজপুত বৈষ্ণবসমাজে আগ্রহের সহিত গীত হইতে লাগিল। আজ পর্য্যন্তও সে গীতধারা মীরার প্রতিষ্ঠা বহন করিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। ইহার পরে তিনি ভক্তিরসাত্মক কাব্য 'রাগ-গোবিন্দ' এবং জয়দেব-কৃত 'গীত-গোবিন্দের' একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই দুইখানি গ্রন্থই সর্ব্বজনপ্রশংসিত। মীরার স্বামীও একজন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রবাদ আছে যে, তাঁহার কবিতা-লেখার হাতেখড়ি তাঁহার মহিষীর নিকটেই হইয়াছিল।

মীরা ধনসম্পদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। স্বাধীনভাবে মুক্তকণ্ঠে দিবারাত্র কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও জনসাধারণে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর কাছে নিজের মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলেন। কুম্ভের আদেশে রাজ-অন্তঃপুরে রঞ্ছোড় দেবের এক মন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মাত্রেই সে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল। মীরা এই সকল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের সহিত অসঙ্কোচে মিশিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—তাহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ। শেষে ইহাতে মীরা এতদূর মত্ত হইয়া পড়িলেন যে, প্রত্যহ স্বামীর পরিচর্য্যার কথা তাঁহার মনেই পড়িত না।

মহিষীর এই আচরণে কুম্ভের মন দিনে-দিনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি রাজা, তাঁহার ভোগের প্রবৃত্তি তখনও সম্পূর্ণ প্রখর। তিনি চাহিতেন, তাঁহার অসংখ্য বিলাসসামগ্রীর সহিত মিশিয়া মীরাও তাঁহার বিলাসের উপকরণ হইয়া উঠুক; কিন্তু মীরা কিছুতেই স্বামীকে সে-ভাবে ধরা

দিতেন না। কুম্ভ ক্রমেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী দিন-দিন তাঁহার প্রতি অনাসক্ত হইয়া উঠিতেছেন—তিনি নিজে ইহার প্রতিকারের কোনো বিধান করিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি পুনর্বিবাহের সঙ্কল্প করিলেন। মীরার কাছে যখন এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, অকুণ্ঠিত-চিত্তে তিনি তাহার অনুমোদন করিলেন।

মীরার মত পাইয়া কুম্ভ কন্যা খুঁজিতে লাগিলেন। ঝালবার-রাজকুমারীর রূপ-লাবণ্যের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; তিনি তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীর সহিত মন্দার-রাজকুমারের বিবাহ হইবার কথা তখন পাকা হইয়া গিয়াছে। কুম্ভ তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না;—বিবাহরাত্রে ঝালবার-কুমারীকে হরণ করিয়া আনিলেন। মন্দার-রাজকুমারের প্রতি ঝালবার-কুমারী অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন,

—তাঁহাকে ভালবাসিতেন। চিতোরের রাজা তাঁহাকে হরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোহরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কুম্ভের অদৃষ্টে বিধাতা বোধ হয় দাম্পত্যসুখ লেখেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজ-অন্তঃপুরস্থ রঞ্ছোড় দেবের মন্দিরে সকল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরই প্রবেশাধিকার ছিল। একদিন মন্দার রাজ-কুমার বৈষ্ণবের বেশে সেই মন্দিরে আসিয়া দেখা দিলেন। যে সমস্ত অতিথি মন্দিরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও দেবদর্শনে আসিতেন তাঁহাদের কেহই অভুক্ত অবস্থায় ফিরিতে পাইতেন না, সকলকেই দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইত। সেদিন সকলে ভোজন শেষ করিয়া গেলেন কিন্তু মন্দার-কুমার জলস্পর্শও করিলেন না। অতিথি অভুক্ত থাকিলে অধর্ম্ম হইবে, ধর্ম্ম-প্রাণা মীরা তাহাতে বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি এই নবীন বৈষ্ণবকে আহার গ্রহণ

করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। অনেক অনুরোধ-বচনের পর তিনি মীরাকে বলিলেন, —"আপনি যদি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করেন, তবেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব; আপনি প্রতিজ্ঞা করুন।" মীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন মন্দার-কুমার নিজের পরিচয় এবং তাঁহাদের প্রণয়-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া ঝালবার-কুমারীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন।

রাজপুতের অন্তপুরে পরপুরুষকে প্রবেশ করানো বড়ই বিপদজনক; কিন্তু রাজকুমারের মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে মীরার সদয়প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই সকল বিপদ মাথায় লইয়া তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইল।

মীরা অন্তপুরেব গুপ্তদ্বার খুলিয়া রাজকুমারকে ঝালবার-কুমারীর শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কুম্ভ সেই সময় সেই কক্ষদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি বৈষ্ণববেশী মন্দার-রাজকুমারকে চিনিতে পারিলেন; মন্দার-কুমার কুম্ভকে দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন;— প্রণয়িনীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না।

কুম্ভ অবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, মীরার সাহায্যেই মন্দার-কুমার পুরপ্রবেশ করিতে পাইয়াছে। মীরার উপর তিনি অসন্তুষ্টই ছিলেন, এই ঘটনায় অগ্নিতে যেন ইন্ধন যোগ হইল। তিনি মীরাকে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—"অন্তপুরের গুপ্তদ্বার খোলার অপরাধে আমার রাজ্য হইতে তোমাকে নির্ব্বাসিত করিলাম।" এই কঠোর বাণী মীরার হৃদয়কে একটুও চঞ্চল করিতে পারিল না। রাজপ্রাসাদ ও রাজপথ যেন তাঁহার পক্ষে

তুল্য; তিনি স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভগবানের নাম গান করিতে করিতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মীরাকে চিতোরবাসীরা বড়ই শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাসিত। মীরা চলিয়া যাওয়াতে চিতোর নিরানন্দ হইয়া উঠিল। মীরার অপরাধ কাহারো কাছে দোষ বলিয়া মনে হইল না; তাহারা সকলে কুম্ভেরই উপর অসন্তুষ্ট হইল; চারিদিকে তাঁহার নিন্দাবাদ হইতে লাগিল। কুম্ভ তখন মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। অভিমানশূন্যা মীরা বলিলেন,—"আমি চিতোর-রাজের দাসী, তাঁহারই আজ্ঞায় বিতাড়িত হইয়াছি, আবার তাঁহারই আজ্ঞায় পুনরায় রাজ-পুরীতে প্রবেশ করিব। ইহাতে আমার কোনো অভিমান নাই।" এই বলিয়া তিনি চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইতিপূর্ব্বে অন্তঃপুরস্থ দেবমন্দিরে কেবল

বৈষ্ণবদিগকে লইয়া মীরা সঙ্কীর্ত্তন করিতে পাইতেন, এখন তিনি চিতোর-রাজের নিকট হইতে, রাজপথে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া, সঙ্কীর্ত্তন করিবার আদেশ লাভ করিলেন। রাজ্যমধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চিতোরের বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রৌঢ়প্রৌঢ়া, বৃদ্ধবৃদ্ধা সকলেই আসিয়া এই ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগ দিল। চিতোর-রাজধানী সকাল-সন্ধ্যায় মীরা-রচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মীরা জনসাধারণের প্রাণে যেন ধর্ম্মের বন্যা আনিয়া দিলেন; মীরাকে সকলেই দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। শৌর্য্যবীর্য্যসম্পদে গরীয়ান চিতোর, ভক্তির সঞ্জীবনী নির্ঝরিণী-বারিতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। যে ভক্তির প্রস্রবণ এতদিন প্রাসাদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে রুদ্ধ ছিল, আজ তাহা প্রবলবেগে লোকসমাজের উপরে আসিয়া পড়িল;—দেশদেশান্তরের লোক মীরার

ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইবার সুযোগ লাভ করিল।

মীরা সাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে একদল খলস্বভাব পরছিদ্রান্বেষী লোক তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিল। মীরার গানে মোহিত হইয়া কোনো ধনশালী ব্যক্তি তাঁহাকে একটি বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করেন, মীরা স্বয়ং তাহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা রঞ্ছোড় দেবের গলায় তাহা পরাইয়া দেন। এই অলঙ্কার গ্রহণ-ব্যাপার লইয়া ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিরা নানাবিধ জঘন্য কুৎসা প্রচার করে। সে সমস্ত কথা কুম্ভের কানে গিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মীরাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মীরা যেন নদীসলিলে দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার এই কলঙ্কের অবসান করেন। পত্র পাইয়া মীরা একবার স্বামীর দর্শন চাহিলেন; কিন্তু কুম্ভ সাক্ষাৎ করিলেন না। মীরা তখন

স্বামী-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন ; নদীর স্রোত তাঁহাকে গ্রাস করিল না,—অজ্ঞান-অবস্থায় তীরের উপর ফেলিয়া দিয়া গেল।

জ্ঞানলাভ করিয়া মীরা পদব্রজে বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। রাজমহিষী আজ পথের ভিখারিণী, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। যেন কৃষ্ণনাম, হরিনাম গানের রস-সুধায় তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা পথশ্রম সকল কষ্ট বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আপন-মনে গান গাহিয়া চলিতে লাগিলেন। যে-পথেই তাঁহার অনিন্দ্য গীতধ্বনি উঠিল তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, মীরা আসিতেছেন। অমনি গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে দলে-দলে লোক গৃহ-সংসার ফেলিয়া মীরার তীর্থযাত্রার সঙ্গ ধরিল।

প্রকাণ্ড একদল ভক্ত যাত্রী লইয়া মীরা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা-অর্চ্চনা করিয়া মনের আনন্দে তাঁহার

দিনপাত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে মীরার যশোগাথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল; তাহাদের মুখে-মুখে মীরার রচিত গানগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। মীরা-সম্প্রদায় নামে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও সংগঠিত হইয়া উঠিল।

কুম্ভের কানে এ সমস্ত কথাই পৌঁছিল; মীরার প্রতি তিনি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলেন, এবং স্বয়ং বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা-পূর্ব্বক তাঁহাকে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। মীরা চিরদিনই স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; এবারেও তিনি স্বামীর কথায় চিতোরে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু অধিকদিন রাজপুরীতে বাস করিতে পারিলেন না। কারণ ধনসম্পদ তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ

হইতে লাগিল। সেইজন্য তিনি আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। তবে কুম্ভের অনুরোধে তিনি মধ্যে-মধ্যে চিতোরে তাঁহাকে দেখা দিতে আসিতেন।

মীরা শেষ-জীবন তীর্থপর্য্যটনেই কাটাইয়া ছিলেন। নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তির আবেশে মীরা প্রায়ই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন; অবশেষে একদিন এমন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন যে আর উঠিলেন না।

চিতোরে এখনও রঞ্ছোড় দেবের সহিত মীরাবাইয়েরও পূজা হইয়া থাকে।

মীরার গানের একটু পরিচয় দিবার উদ্দেশে তৎ-রচিত একটি গানের অনুবাদ * উদ্ধৃত করিলাম :—

(আমায়) চাকর রাখো গো!
(তোমার) ফুলবাড়ীতে থাকবো চাকর
মেল্‌বো ফুলের মেলা,

* কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত।

ঘুম ভেঙে রোজ দেখবো আমি
তোমায় সকালবেলা।
(আমায়) চাকর রাখো গো !

গন্ধ-ফুলের গাছ লাগাবো
লাল সাদা আর নীলা,
বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে
গাইবো তোমার লীলা।
(আমায়) চাকর রাখো গো !

সবুজ শোভার বন সাজাবো,–
জল-ভরা ঝিল্-মাঝে,
শ্যামলে শ্যাম দেখবো তোমায়
সকল ফুলের সাজে।
(আমায়) চাকর রাখো গো !

যোগী এলেন যোগের লোভে
সন্ন্যাসী তপ লাগি,

ভক্ত এল বৃন্দাবনে
ভজন-অনুরাগী।
(আমায়) চাকর রাখো গো !

মীরার প্রভু স্বভাব-গোপন
থির হ'রে মন—ধীরে
(প্রভু) আধেক রাতে দেবেন দেখা
নীল যমুনার তীরে।
(প্রভু) আঁধার রাতে কবেন কথা
নীল যমুনার তীরে।
(আমায়) চাকর রাখো গো !

করমেতিবাই

মীরাবাইয়েরই মত ভক্তিমতী, ধার্ম্মিকা, বিদুষী রমণী আর-একজন ছিলেন; তাঁহার নাম করমেতিবাই। ভক্তমাল্‌গ্রন্থে ইঁহার জীবনীর কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

ইনি দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে খাজল গ্রামের পরশুরাম পণ্ডিত নামে এক রাজপুরোহিতের কন্যা ছিলেন। পরশুরাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এবং তিনি নিজ কন্যাকে অল্প বয়স হইতেই পরম বৈষ্ণবী করিয়া তুলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ ও বৈষ্ণবতত্ত্বে পারদর্শিনী করিবার জন্য তিনি করমেতিকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইহার ফলে করমেতিবাই শৈশব-কালেই বিশেষ বিদ্যাবতী হইয়া উঠেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

সংসারবন্ধনে বাঁধা পড়িবার ভয়ে করমেতি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু পিতার আজ্ঞায় তাঁহাকে পারণীতা হইতে হইয়াছিল।

পিত্রালয়ে যতদিন ছিলেন তাঁহার কষ্টের কোনো কারণ ছিল না; দিবারাত্র মনের আনন্দে হরিনাম ও দেবার্চ্চনা করিয়া সময় কাটাইতেন; কিন্তু স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবা-

মাত্রই চারিদিক হইতে নানারকম অশান্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল। স্বামীর সহিত ঘোর মনোমালিন্যের সূচনা হইল। তাঁহার স্বামী অবৈষ্ণব ও ঘোর বিষয়ী ছিলেন। কাজেই করমেতির প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠান স্বামীর বাধায় প্রপীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি অধিক দিন এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না; স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া পিতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশি দিন তথায় থাকা হইল না। কারণ কিছুদিন পরেই স্বামী তাঁহাকে পুনরায় নিজ আলয়ে লইতে আসিলেন। তখন করমেতি বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। স্বামীর হাত হইতে কি উপায়ে রক্ষা পাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। মনে-মনে বৃন্দাবন যাওয়ার ফন্দি আঁটিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে শয়ন-গৃহ হইতে চুপি-চুপি বাহির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু

যে দিকে যান সেই দিকেই দেখেন দরজা-জানালা সব বন্ধ। অবশেষে নিরুপায় হইয়া উপরের ঘর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। এই প্রকারে বাড়ীর বাহির হইলেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের পথ ত জানেন না, সে কথা চিন্তা করিবার অবসরও নাই, কাজেই যে দিকে চোখ গেল সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন।

প্রভাতে কন্যাকে গৃহে না দেখিয়া পরশুরাম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রাজার নিকটে গিয়া কন্যার নিরুদ্দেশের কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন।

করমেতি এক প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিক্রম করিতেছেন,পশ্চাতে জনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অনুসন্ধানেই লোক আসিতেছে। বৃক্ষাদিশূন্য প্রান্তরে লুকাইবার স্থান নাই ; অনন্যোপায়

হইয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কিছুদূরে এক মৃত উষ্ট্রদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল। শৃগালকুক্কুরে তাহার উদর-গহ্বরের অস্থিমাংস নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে; করমেতি তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। মৃতদেহ পচিয়া গিয়াছে, ভীষণ দুর্গন্ধ, তিষ্ঠানো দায়, তবু তিনি সেখান হইতে নড়িলেন না। যে রাজ-অনুচরেরা তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল তাহারা কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন করমেতি উষ্ট্রদেহ হইতে বাহির হইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। তাঁহার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। তিনি বৃন্দাবনেই বাস করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনা তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ হইল।

পরশুরাম কন্যার অদর্শনে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি খাজল গ্রাম ত্যাগ করিয়া

দুহিতার অনুসন্ধানে দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বৃন্দাবনে কন্যার সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন, করমেতি চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন, দুই চক্ষু বহিয়া দরদরধারে প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে, একটি দিব্য জ্যোতি যেন তাঁহার দেহখানিকে ঘিরিয়া আছে। পিতা, কন্যার এই দেবীসদৃশ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন।

পরশুরাম কন্যাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু করমেতি বিনয়বচনে পিতাকে নিরস্ত করিলেন। তখন পরশুরাম নয়নের জল মুছিতে-মুছিতে স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। কন্যার সকল বৃত্তান্ত তিনি রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন।

রাজা অত্যন্ত ভগবৎ-প্রেমিক ছিলেন। তিনি করমেতির কৃষ্ণভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার মানসে বৃন্দাবনে গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাঁহার বাসের জন্য বৃন্দাবনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে ভূমধ্যস্থ অনেক কীটাণুর জীবন বিনষ্ট হইবে বলিয়া করমেতি আপত্তি করিলেন; রাজা, তত্রাচ কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই কুটীরের ধ্বংসাবশেষ আজও করমেতির কীর্ত্তিস্মৃতি বহন করিতেছে।

প্রবীণাবাই

বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎ-সিংহের সভা অনেক কবিরত্নই উজ্জ্বল করিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিদুষী প্রবীণাবাই ও পণ্ডিত কেশবদাসই প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রবীণা-বাই ছোট-ছোট কবিতা রচনা করিতেন; সেগুলি রাজসভায় ও অন্যত্র বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শোনা যায় কবি কেশবদাস

এই বিদুষী রমণীর সম্মানার্থ তাঁহার 'কবি-প্রিয়া' নামক কাব্য রচনা করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণাবাইয়ের কবিত্ব-যশ দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সম্রাট আকবর তাঁহার সেই যশোগাথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সভায় প্রবীণাকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। ইহাতে আকবর অসন্তুষ্ট হন এবং ইন্দ্রজিতের এই বিদ্রোহাচরণের জন্য দশ লক্ষ মুদ্রা জরিমানা করেন। এই উপলক্ষ্যে কবি কেশবদাস আকবরের দরবারে গমন করিয়া বীববলের সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত করেন বটে কিন্তু প্রবীণা দেবী নিষ্কৃতি পান নাই। সম্রাট তাঁহার গুণপনা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য এতই অধীর হইয়া ছিলেন যে প্রবীণাকে সম্রাট-সমক্ষে উপস্থিত হইতেই হইল। শোনা যায় আকবর এই বিদুষী রমণীর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া-

ছিলেন। দরবারে আকবরের সহিত প্রবীণা-বাইয়ের যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল এবং তৎকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহা একখানি কাব্যগ্রন্থে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

মধুরবাণী

তাঞ্জোরের অধিপতি রঘুনাথ ভূপাল বড় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি অসংখ্য পণ্ডিত লইয়া রাজসভায় বসিতেন, সেখানে তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম ও কাব্যের আলোচনা চলিত;—পণ্ডিতেরা প্রতিদিন নূতন নূতন কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইয়া তুষ্ট করিতেন। এই সকল পণ্ডিতের পার্শ্বে বসিয়া অসংখ্য বিদুষী নারীও রাজসভা উজ্জ্বল করিতেন। তাঁহারাও পণ্ডিতদিগের সহিত ধর্ম্ম ও কাব্য আলোচনায় যোগ দিতেন; এবং প্রতিদিন মহারাজকে নব-নব-ছন্দে-

গাঁথা কাব্য শুনাইতেন। এই সকল বিদুষীর মধ্যে মধুরবাণীই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মহারাজ সকল সভাপণ্ডিত অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক সম্মান করিতেন; তাঁহার রচনা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন।

একদিন মহারাজ শত শত বিদুষী রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় বসিয়া আছেন; —কোনো রমণী তাঁহাকে রামায়ণ গান শুনাইতেছেন, কেহ বা ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনাইতেছেন; সে দিন এক বিদুষী মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া এক কবিতা রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহারাজের কিরূপ অচলা ভক্তি তাহাই বর্ণিত ছিল। কবিতায় যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্তব-স্তুতি ছিল, রামচন্দ্রের চরিত্রব্যাখ্যান ছিল, সেই অংশগুলি শুনিতে-শুনিতে রাজা তন্ময় হইয়া গেলেন। কবিতা শেষ হইলে তিনি বলিলেন—'আমি এতবার রামচরিত্র শুনিয়াছি

তবু উহাতে কখনো আমার অরুচি জন্মে নাই; যত বার শুনি তত বারই নূতন বলিয়া বোধ হয়, তত বারই বিপুল আনন্দ লাভ করি। আমার সভাপণ্ডিতেরা ও বিদুষী মহিলারা আমাকে বহু বার রামনামগান নানা ছন্দে রচনা করিয়া শুনাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনার মধ্যে যেন কি-একটা অভাব বোধ করিয়াছি, মনে হইয়াছে যেন সব কথা তাহাতে বলা হয় নাই, রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন যেন সম্পূর্ণ হইতেছে না। আমার বিশেষ ইচ্ছা এমন করিয়া কেহ রামচরিত্র রচনা করুন যাহাতে আর এই অভাব-বোধ না হয়।"

রঘুনাথ, সভার সকলকে আহ্বান করিয়া ঐ কার্য্যের ভার দিতে চাহিলেন; কিন্তু কি নারী, কি পুরুষ কেহই সাহস করিয়া সে ভার গ্রহণ করিতে উঠিলেন না। মহারাজ বিষণ্ণ মনে সে দিন সভা ভঙ্গ করিলেন।

কথিত আছে সেই রাত্রে মহারাজ স্বপ্নে

দেখিলেন যেন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"নরপতি! বিষন্ন হইও না। সরস্বতীসমা মধুরবাণী তোমার সভায় আছেন, তাঁহার গানে আমি সন্তুষ্ট, তাঁহাকেই তুমি রামায়ণ রচনার ভার দাও,—তিনিই এই কার্য্যের একমাত্র উপযুক্ত।"

পর-দিন সকালে মহারাজ মধুরবাণীকে স্বপ্নের কথা বলিলেন। মধুরবাণী তাহা শুনিয়া বলিলেন—"রাজার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তিনি যখন সহায় আছেন তখন এ কার্য্যে আমার কোনো দ্বিধা নাই—আমার সমস্ত ত্রুটি অন্তর্যামী মার্জ্জনা করিবেন।"

মধুরবাণীর সেই তালপত্রে-লেখা রামায়ণ বাঙ্গালোর মালেশ্বর বেদবেদান্ত মন্দির নামক পাঠাগারে রক্ষিত আছে। ইহার সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই।

যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চতুর্দ্দশ সর্গ পর্য্যন্ত আছে। ঐ চতুর্দ্দশ সর্গ

নানা ছন্দে লেখা দেড়হাজার শ্লোকে পরিপূর্ণ। প্রথমে সূচনায় গ্রন্থকর্ত্রী দেবতাদের নিকট তাঞ্জোরাধিপতি রঘুনাথের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন; তাহার পর, তিনি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বাণভট্ট, মাঘ প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সম্মান-জ্ঞাপন করিয়াছেন; ইহার পরে সুললিত ভাষায় রঘুনাথ-ভূপালের রাজসভার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; তৎপরে পূর্ব্ববর্ণিত এই গ্রন্থ রচনার সূচনা বিবৃত হইয়াছে। এই বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে সে সময় শত শত বিদুষী রমণী, রঘুনাথের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকিতেন। এইখানে প্রথম সর্গ শেষ। তাহার পর আসল গ্রন্থ রামায়ণ আরম্ভ; ইহাতে রামায়ণের ঘটনাসমূহ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত আছে।

মধুরবাণী অশেষ গুণবতী ছিলেন। তিনি চমৎকার বীণা বাজাইতে পারিতেন,—তাঁহার

বীণার আলাপ শুনিলে মনে হইত যেন অমর-লোক হইতে স্বয়ং সরস্বতী আসিয়া বীণার তারে ঝঙ্কার দিতেছেন।

তিনি তেলেগু ও সংস্কৃত এই দুই ভাষাই খুব ভালোরকম জানিতেন। কথিত আছে, তাঁহার এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে তিনি বারো মিনিট সময়ের মধ্যে এক-শত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তিনি একখানি নৈষধকাব্য ও একখানি কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছিলেন। মধুরবাণী সম্বন্ধে আর কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

মোহনাঙ্গিনী

ইনি কৃষ্ণরয়ালু নামে দাক্ষিণাত্যের এক রাজার কন্যা। বাল্যকালে ইনি পিতার নিকট হইতে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজা রামরয়ালুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরও অধিকাংশ সময় তিনি গ্রন্থপাঠ

ও ভাষা-শিক্ষায় কাটাইতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন এবং যৌবনে কাব্য-রচনায় যশস্বিনী হইয়া উঠেন। ইনি মরিচী-পরিণয় নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; গ্রন্থখানি পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; কথিত আছে, পিতার রাজসভায় ইনি নিজের রচনা পাঠ করিয়া সভাপণ্ডিতগণকে মুগ্ধ করিতেন।

মোহনাঙ্গিনী পূর্ণযৌবনে বিধবা হন, এবং স্বামীর চিতাশয্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

মল্লী

ইনিও একজন দাক্ষিণাত্যবাসিনী। রাজা কৃষ্ণদেবের সময় ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভ করেন। মল্লী একজন কুম্ভকারের কন্যা ছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনা মৌলিকতা ও প্রতিভাপূর্ণ

ছিল। কথিত আছে, স্নানের পর চুল শুকাইবার সময় তিনি লিখিতে বসিতেন। এইরূপে তিনি একখানি রামায়ণ আগাগোড়া রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণখানি এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করে যে, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সেখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

অভয়ার ও তাঁহার ভগিনীগণ

ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী ভগবান্ নামে এক ব্রাহ্মণের দুহিতা। ইনি কিরূপ বিদ্যাবতী ছিলেন তাহা ইঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ হইতেই বুঝিতে পারা যায়;—লোকে বলিত ইনি দেবী সরস্বতীর কন্যা।

অভয়ারের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ সকলেই সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতারা প্রতিভাশালী কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং ভগিনীগণেরও ঐ খ্যাতি

অল্প ছিল না ; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সকলকে সব বিষয়ে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ এবং ভূগোলে তাঁহার জ্ঞান অসীম ছিল। তিনি ভূগোলসম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ কবিতায় রচনা করেন এবং জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আমরণ অবিবাহিতা ছিলেন। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার যশোগান করিতেন।

উপাগ্‌গা নামে ইঁহার এক ভগিনী 'নীলি পাটল' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; এবং ভল্লী ও মুরেগা নামে ভগিনীদ্বয় নানা খণ্ডকাব্য ও কবিতা রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

নাচী

দাক্ষিণাত্যে এলেশ্বর উপাধ্যায় নামে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে, বিজ্ঞানে,

আয়ুর্ব্বেদে এবং জ্যোতিষে তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। তাঁহারই এক কন্যার নাম নাচী। নাচী অল্পবয়সে বিধবা হন। উপাধ্যায়-মহাশয়ের একটি টোল ছিল, তাহাতে তিনি নানা দেশের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার কন্যা যখন বিধবা হইলেন তখন তাঁহার শিষ্যগণের সহিত এই কন্যাকেও তিনি শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। নাচী তেমন প্রখরবুদ্ধি ও মেধাবতী ছিলেন না, সহজে কোনো বিষয় শিক্ষা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য মনে মনে তাঁহার ভারি দুঃখ ছিল।

উপাধ্যায়মহাশয়ের অনেক ছাত্রও নাচীর মত অল্পবুদ্ধি ছিল; তাহাদের বুদ্ধি প্রখর ও স্মৃতিশক্তি প্রবল করিবার জন্য এলেশ্বর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মন্থন করিয়া জ্যোতিষ্পতি নামে এক প্রকার লতার গুণ আবিষ্কার করেন; সেই লতার রস সেবন করিলে বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এলেশ্বর পণ্ডিত এই

জ্যোতিষ্পতি-রস সেবন করাইয়া অনেক ছাত্রকে মেধাবী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নাচী তাহা শুনিয়া একদিন গোপনে সেই রস কণ্ঠ ভরিয়া পান করিলেন। ঐ রস বেশি-মাত্রায় সেবন করিলে বিষতুল্য ফল দান করে। নাচীর অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, তিনি সেই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন; এবং তথায় অর্দ্ধ-অচৈতন্যভাবে আট ঘণ্টাকাল পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা এ সমস্ত কিছুই জানিতেন না; তিনি কন্যার আকস্মিক অদর্শনে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া অবশেষে 'নাচী নাচী' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জলের গুণে ততক্ষণে বিষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; নাচী পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কূপমধ্য হইতেই উত্তর দিলেন। তখন পিতা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। কথিত আছে, ইহার পরেই নাচী অসীম



মেধাবতী হইয়া উঠেন; এবং অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

ইহার পর নাচী কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন; তাঁহার কবিতাগুলি ভাবমাধুর্য্যে ও ভাষাচাতুর্য্যে সম্পদশালিনী। সর্ব্বশেষে 'নাচী-নাটক' নাম দিয়া তিনি নিজের জীবনচরিত কাব্যাকারে প্রণয়ন করেন, তাহাতে তাঁহার দুঃখময় বৈধব্যজীবন করুণভাবে বর্ণিত আছে।

পরিণত বয়সে নাচী তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন; এবং নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নানাস্থানের পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় তর্কে দিগ্বিজয় করিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গুলবদন বেগম

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নবাব এবং আমিরওমরাহদিগের কন্যারা তখন

রীতিমত লেখাপড়া শিখিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালের অনেক মুসলমানরমণীর সুকোমল চরিত্র বিদ্যার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া আছে।

গুলবদন বেগম দিল্লীশ্বর বাবর সাহের দুহিতা এবং সম্রাট আকবরের পিতৃস্বসা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা হুমায়ুনের সহিত সর্ব্বদা একত্রে থাকিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। হুমায়ুন রাজ্যসম্বন্ধীয় অনেক কার্য্য তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না। তিনি ভ্রাতার সম্পদে বিপদে প্রধান সহায় ছিলেন; এমন কি যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

গুলবদন 'হুমায়ুন-নামা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে হুমায়ুনের বিস্তৃত জীবনী

এবং তাঁহার সময়কার অনেক প্রধান প্রধান ঘটনা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিভারিজ সাহেবের পত্নী এই হুমায়ুন-নামার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গুলবদনের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

জেবুন্নেসা

জেবুন্নেসা দিল্লীর পরাক্রান্ত মোগলসম্রাট ঔরংজেবের কন্যা। ইহার মাতাও এক মুসলমান নৃপতির কন্যা ছিলেন। সম্রাট জেবুন্নেসাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং বাল্যবয়সেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া নিজেই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেবুন্নেসার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল, অল্প বয়সেই তিনি সমগ্র কোরাণসরিফখানি কণ্ঠস্থ করিয়া পিতার নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ঔরংজেব

ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণ-রাজিতে জেবুন্নেসা অতুলনীয়া ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বিপুল রাজৈশ্বর্য্য ও বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হইয়াও তিনি এই ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই; সুশিক্ষা ও অধ্যবসায়গুণে ইহার যথোচিত বিকাশসাধনেই সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক বিষয়েই তিনি তৎকালীন সমাজের অগ্রবর্ত্তিনী ছিলেন; তাঁহার ন্যায় রমণীর পক্ষে ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে। আরব্য ও পারস্য ভাষায় জেবুন্নেসার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কথিত আছে, তাঁহার হস্তাক্ষরও খুব সুন্দর ছিল এবং তিনি নানা ছাঁদে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার পাঠানুরাগও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে

ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

বাল্যেই জেবুন্নেসার কবিত্বশক্তি বিকশিত হইয়া উঠে। তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গদ্য-রচনায়ও তাঁহার শক্তি কম ছিল না। রুচির নির্ম্মলতা ও ভাষার মাধুর্য্যই তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার কবিতাগুলি আজও মুসলমান পণ্ডিতগণের মুখে মুখে সুর-লয়ে আবৃত্তি হইতে শুনা যায়।

জেবুন্নেসা যে কেবল বিদ্যানুরাগী ছিলেন তাহা নহে, শিক্ষিত ও গুণবান্ বক্তিবর্গকেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য এবং উৎসাহদান করিতেন। তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে প্রতিপালিত হইয়া অনেক লেখক, কবি ও ধার্ম্মিক লোক স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানে দেহ-মন নিয়োগ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মোল্লা সাফিউদ্দীন আরজবেগি কাশ্মীরে থাকিয়া 'তফসির্-ই-কবির্' নামক

গ্রন্থের অনুবাদ করেন, ইহা জেবুন্নেসারই অনুগ্রহের ফল। আরজবেগি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ গ্রন্থের নাম "জেবুনতফসির" রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থকার তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ জেবুন্নেসার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, সেকালে শিক্ষিত সমাজে জেবুন্নেসার প্রতিপত্তি বড় সামান্য ছিল না। রাজনীতিক্ষেত্রেও জেবুন্নেসার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত রাজনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে রৌশন-আরাই ঔরংজেবের প্রধান সহায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর জেবুন্নেসাই তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া পিতার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ঔরংজেব এই বুদ্ধিমতী কন্যার উপদেশ না লইয়া প্রায় কোনো গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

জেবুন্নেসার বয়স তখনও ২৫ বৎসর অতিক্রম করে নাই, সম্রাট সেই সময় একবার অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্নেহময়ী কন্যা তখন বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ কাশ্মীরে যাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। কন্যার পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ হইলেও, ঔরংজেব এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে সাহস করিলেন না; কারণ বৃদ্ধ সাজেহান তখনও আগরার দুর্গে অবরুদ্ধ। শোনা যায়, তিনি কাশ্মীরে গেলে সেই সুযোগে রাজ্যমধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইতে পারে এই মনে করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত সম্রাট্ না কি পিতৃহত্যার কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো গুরুতর কার্য্য তিনি জেবুন্নেসাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না; কন্যাও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া নানারূপ উপদেশে এই মহাপাপের অনুষ্ঠান হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। শীঘ্রই সাজেহানের মৃত্যু হইল; তখন ঔরংজেব নিশ্চিন্ত-

মনে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। জেবুন্নেসাও পিতার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যতকাল জীবিতা ছিলেন, জেবুন্নেসা সর্ব্বদা পিতার কাছে থাকিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য-উপদেশ দিতেন।

কেহ-কেহ বলেন, জেবুন্নেসা শিবজীকে ভালোবাসিতেন। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। লোকমুখে শিবজীর বীরত্বগাথা শুনিয়া না কি উঁহার প্রতি সম্রাট-দুহিতার চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

যেদিন রাজা জয়সিংহের প্ররোচনায় ভুলিয়া শিবজী, ঔরংজেবের সহিত নিজের বিবাদ ভঞ্জন করিবার আশায় দিল্লীর আম-দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন, সেইদিন যবনিকা-অন্তরাল হইতে জেবুন্নেসা তাঁহাকে প্রথম দেখেন।

যাঁহার প্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পমান, সেই ঔরংজেবের সম্মুখে শিবজী যখন নির্ভয়ে সগর্ব্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার সেই অটল বীরমূর্ত্তি, প্রতিভা-প্রদীপ্ত তীব্রচক্ষু,

তেজস্বী অঙ্গভঙ্গী, জেবুন্নেসা মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কল্পনায় যে-বীরত্বের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, চোখের সম্মুখে তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া জেবুন্নেসার চিত্ত শ্রদ্ধায় ও প্রেমে ভরিয়া উঠিল ;- তাঁহার মনপ্রাণ সেই মহারাষ্ট্রীয় বীরের পদতলে যেন আপনি লুটাইয়া পড়িল।

সম্রাট-দরবারে শিবজীর যতটা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, ঔরংজেব তাহা দান করিলেন না। শিবজী তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে-মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সভাসদ্ ও অমাত্যবর্গ তাহাতে মুখ-টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু জেবুন্নেসার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল!—প্রেমাস্পদের অসম্মানে সামান্য রমণীর ন্যায় এ অভিমানের ক্রন্দন নয়; সাধারণের সমক্ষে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে 'বীরের অপমানে ধর্ম্মের অপমান দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল!

সভা ভঙ্গ হইলে জেবুন্নেসা পিতৃসমক্ষে গিয়া দারুণ অভিমানের সহিত বলিলেন —"জাঁহাপনা, সভামধ্যে বীরের অসম্মান করাটা ভালো হয় নাই।" কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

চতুর ঔরংজেব বিস্ময়ের সহিত কন্যার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন ; আসল কথাটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কন্যাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন—"বুঝিয়াছি, শয়তানের ফাঁদে পা দিয়াছ! বেশ! কাফের যদি পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমাকে বিবাহের অনুমতি দিব।"

কথাটা শুনিয়া জেবুন্নেসা লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি নিজের সুখের জন্য বিবাহের সম্মতি লইতে পিতার নিকট আসেন

নাই, বীরের অপমানের প্রতিবিধান করিতেই আসিয়াছিলেন, এই কথাটা আর পরিস্কার করিয়া পিতাকে বলিতে পারিলেন না! মনে-মনে কেবলই নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন —"ধিক্ আমাকে! নিভৃততম হৃদয়ের গোপন কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না! কেবল স্বার্থটাই প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম!"

সেইদিন হইতে জেবুন্নেসা তাঁহার প্রেম অতি সঙ্কোচে ও গোপনে আপনার মধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি কখনও শিবজীকে লাভের জন্য উন্মাদিনী হইয়া ফেরেন নাই, শিবজীর প্রেম পাইবার আশা মনের কোণেও কখনো স্থান দেন নাই,—তাঁহার ভালোবাসা কোনো দিন প্রতিদানের অপেক্ষাও রাখে নাই। শিবজীর যে অসীম বীরত্ব, অটল তেজ, তাহাতেই তিনি মুগ্ধ ছিলেন, তৃপ্ত ছিলেন। তিনি শত্রু-কন্যা, মুসলমান-দুহিতা, তাঁহাকে বিবাহ করিতে

হইলে শিবজীর সেই তেজ পাছে খর্ব্ব হইয়া যায় সেইজন্য তিনি কখনো শিবজীর কাছে আপনার প্রেম প্রকাশ করেন নাই, কখনো তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করেন নাই,—শিবজীকে মহত্ত্বের যে উচ্চশিখরে স্থাপিত দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট দেখিতে তিনি কস্মিন-কালেও আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। নিজের ভালোবাসার দ্বারা শিবজীর নামের অপমান করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

জেবুন্নেসা যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবনের একটি করুণ দিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ;—মনে হয় কাব্য-রাজ্যে তিনি আত্ম-গোপন করিতে পারেন নাই।

জেবুন্নেসার কবিতায় তাঁহার জীবনের ব্যর্থতার আভাস উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে ;—কবিতার ছত্রে ছত্রে যেন একটা নিরাশ-

প্রেমের আকুল গান কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

গরূচে মন্ লায়লি হস্তম্
দিল চুঁ মজনু দর হাওয়াস্ত্।
সর্-ব-সহরা মী জনম্
লেকিন হায়া-ই-জেঞ্জির পাস্ত।

বুল্‌বুল্ আজ সাগিরদিয়ম্
শুদ্ হম্‌নিশিনে গুল্ ববায।
দিদারে মহব্বৎ কাবিলম্
পরওয়ানা হম্ সাগির্দ্দে মাস্ত।

দরনেহা খুনম্ জাহির
গরূচে রঙ্গে নাজকাম্।
রঙ্গে মন্ দরমন্ নেহাঁ
চু রঙ্গে সুর্খ্ অন্দর হিনাস্ত।

বস্‌কে বারে যম্ বরূ উ আন্দাখ তম্।
জামা নীলি করদ্ ইনঁাক
বিঁকে পুস্তে উদোতাস্ত।
দোখতরে শাহাম্ ওলেকিন্
রুহ-ই-মুসাফির আওরদা আম্।

জেব ও জিনৎ বস্ হামিনস্
নামে মন্ জেবউন্নিসাস্ত্।

অর্থাৎ :—

"প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হইয়া মরু-প্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল, আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তেমনি করিয়া ছুটিয়া বেড়াই ; কিন্তু আমার পা যে সরমসম্ভ্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা !

"এই যে বুল্‌বুল্ সারাদিন গোলাপের কাছে-কাছে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কানে-কানে চুপে-চুপে প্রেমালাপ করিতেছে, এ আমারই কাছে প্রেম শিখিয়াছে।

"এই যে আমার সম্মুখের কাচের ফানুসের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোক, ইহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া শত-শত পতঙ্গ যে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, সে-আত্মত্যাগ তাহারা আমারই কাছে শিখিয়াছে।

"মেহেদিপাতার বাহিরের স্নিগ্ধ শ্যামলতা

যেমন তাহার ভিতরের রক্ত-রাগকে লুকাইয়া রাখে, তেমনি আমার শান্ত মূর্ত্তি আমার মনাগুনের জ্বলন্তরাগ গোপন রাখিয়াছে!

"আমার হৃদয়ের দুঃখভারের কিয়দংশ মাত্র আকাশকে দিয়াছি ; আকাশ তাহারই ভারে, দেখ, নীল হইয়া গিয়াছে, নত হইয়া পড়িয়াছে!

"আমি বাদশাহের কন্যা, কিন্তু প্রাণ আমার অতিথির মতন। ধন, ঐশ্বর্য্য আমার ভালো লাগে না, দারিদ্র্যের পীড়ন আমার কাছে বেশ! আমি জেবুন্নেসা (অর্থাৎ সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা); এইটুকু গৌরবই আমার যথেষ্ট!"

গুফ্‌তম্ আজ্ ইশকে বুতাঁ
আয় দিল চে হাসেল করদাই।
গুফ্‌ত্ মারা হাসেলে জুজ
নালাহয়ে হাম্ নিস্ত॥

"ভালোবাসার অনেক কথাই ত বলা

হইল, কিন্তু ওরে আমার মন, তুই কি লাভ করিলি? মন উত্তর করিল—অশ্রুমালা ভিন্ন আর কিছুই নয়।”

হরকস্ দর আনদ্ দর জাহাঁ
আখিরূ ব মতলবহা রশিদ
পীর শুদ জেবুন্নিসা
উ-রা খরিদারে ন শুদ ॥

“যে-কেহ সংসারে আসিয়াছিল সেই অবশেষে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া গেল; কিন্তু জেবুন্নেসা বৃদ্ধা হইয়া গেল, তবু তাহার খরিদ-দার মিলিল না; অর্থাৎ কাহারও সহিত মিলন হইল না।”

জেবুন্নেসার অন্যবিধ কবিতার মধ্যে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

আগর্ দুশ্‌মন্ দুতা গরদদ্
জে তাজিমাশ মস্ত গাফেল;
কমা চন্দ আঁকে খান্ গরদদ্
মকাশ কারগরু আয়েদ্।

"তোমার শত্রু তোমার কাছে নত হইলেও তাহার নম্রতায় ভুলিয়ো না; কারণ ধনু (কুটিল) যত নত হয়, তাহার কার্য্যও তত বলবত্তর হয়।"

লক্ষ্মীদেবী

ইনি মিথিলারাজ শিবসিংহের মহিষী; লছিমা নামেই পরিচিত। ইনি বিদ্যাচর্চ্চার বড় অনুরাগিনী ছিলেন, সেইজন্য নিজগৃহে তিনি অনেক মৈথিল-পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন। বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরুমিশ্র ও মিতাক্ষরটীকা-রচয়িতা বালম্ভট্ট ইঁহারই আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, পণ্ডিতদিগের সহিত তিনি ঐ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কূট প্রশ্ন দক্ষতার সহিত বিচার করিতেন। ইনি স্বয়ং মিতাক্ষর-

ব্যাখ্যান নামক প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরটীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। শুনা যায় তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতার অনুবাদ * এই :—

মৃণাল ভাঙিয়া করিতে ভোজন,
  জ্যোৎস্না ভাবিয়া শিহরি-উঠে!
তৃষিত সে, তবু, তারকা ভাবিয়া,
  না ছোঁয় সলিল পত্রপুটে!

নিশি না আসিতে দেখে সে আঁধার,
  কমলে নিরখি' ভ্রমর-বীথি!
দিবসে করিল দুখ-শর্ব্বরী,
  চক্রবাকের বিরহ-ভীতি!

* সুকবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত।

রামমণি

এই বাংলা-দেশের কাব্য-ইতিহাসেও বিদুষী রমণীর পরিচয় আছে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে অনেক স্ত্রী-কবি-রচিত পদ পাওয়া যায়।

রামমণি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনা স্ত্রী-কবি। ইনি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িকা। রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক পদাবলী ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

রজক-কন্যা রামমণি অনশনে ও অসহায় অবস্থায় ভ্রমণ করিতে-করিতে বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হন। চণ্ডীদাস ঐ মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তিনি রামমণির দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে মন্দিরের দাসীরূপে নিযুক্ত করেন। রামমণি দেবীর প্রসাদ ভোজন করিয়া সেইস্থানে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীদাস রামমণির পরিচয় দিতেছেন :—

রামিনী নামিকা, রজক বালিকা,
অতি দৈন্যাবস্থায়।
হাটে ঘাটে মাঠে, কাল কাটাইয়া,
ভিক্ষা মাগিয়া খায়॥

দেখিয়া তাহার ক্লেশ অপার,
যতেক ব্রাহ্মণচয়।
মন্দির শোধন, কাজে নিয়োজিল,
রহে দেবীর আশ্রয়॥

অলপ বয়সে, দুখিনী রামিনী,
কাজেতে নিযুক্ত হল।
পনড়া প্রসাদ, ভুঞ্জন করিয়া,
ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥

রামিনী কামিনী, কাজেতে নিপুণা,
সকলের প্রিয়তমা।
চণ্ডীদাস কহে, তাহার পিরীতি
জগতে নাহি উপমা॥

কথিত আছে, চণ্ডীদাস এই রামমণিকে ভালোবাসিয়াছিলেন ; রামমণিও চণ্ডীদাসকে

ভালোবাসিতেন। এই প্রেমের পরিচয় রামমণি-লিখিত নিম্নলিখিত পদগুলি হইতে পাওয়া যায়ঃ—

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে,
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ,
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥

ত্রুটীসম কাল, মানি সুজঞ্জাল,
যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥

কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল,
শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে এ দুই নয়নে,
নিমেষ দিয়াছে কেবা ॥

যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন,
নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক,
দোষ দিয়া বিধাতারে।

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার॥

তারপর চণ্ডীদাস যখন চিতাশয্যায় শায়িত তখন রামমণি উন্মাদিনী হইয়া গাহিতেছেন—

কোথা যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর,
দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক,
ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু,
মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে,
বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথী, ক্রূর অতিশয়,
বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে দুখসিন্ধুনীরে
অবলা ভাসাতে নাই॥
পিরীতি জ্বালিয়া, যদিবা যাইবা,
কবে বা আসিবে নাথ।

রামীর বচন, করহ পালন,
দাসীরে করহ সাথ ॥

চণ্ডীদাস ও রামমণির প্রেমের মধ্যে কোনো কুভাব ছিল না। প্রেমের নির্ম্মল জ্যোতিতে রামী-রজকিনীর চরিত্র উদ্ভাসিত। কারণ, দেখা যায়, চণ্ডীদাস রামমণিকে ভাবাবেশে কখনো গুরু, কখনো মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন :—

তুমী রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।

এবং চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রেমাসক্ত বলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া তাঁহাকে বাশুলী-পূজার কার্য্য হইতে অপসৃত করিলে, রামমণি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন :—

কি কহিব বঁধু হে বলিতে না যুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায় ॥
অনামুখ মিনসেগুলার কিবা বুকের পাটা।
দেবীপূজা বন্ধ করে কুলে দেয় বাটা ॥

দুঃখের কথা কইতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে না বলতে পারি মরি বুক ফেটে ॥
ঢাক পিটিয়ে সহজবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে ॥
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে।
ঝঞ্জনা পড়ুক তার মস্তক উপরে ॥
অবিচার পুরীদেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব ॥
বাশুলী দেবীর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয় ॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা ॥

ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপী, রসময়ী

রামমণি ব্যতীত যে সকল স্ত্রী-কবি-রচিত পদদ্বারা বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ অলঙ্কৃত হইয়া আছে তাঁহাদের জীবন-চরিত দুষ্প্রাপ্য। কেবল তাঁহাদের রচিত পদের ভণিতায় তাঁহাদের

ঝ

নামটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই সকল স্ত্রী-কবির মধ্যে ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপী ও রসময়ী প্রসিদ্ধা। এখানে আমরা কেবল গোপী-প্রণীত একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

গোষ্ঠ-লীলা।

দণ্ডবৎ হৈয়া মায়, সাজিল যাদব রায়,
সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল।
বরজে পড়িলা ধ্বনি, শিঙ্গা বেণু রব শুনি,
আগে ধায় গোধনের পাল॥
গোঠেরে সাজল ভাইয়া, যে শুনে সে যায় ধাঞা,
রহিতে না পারে কেহ ঘরে।
শুনিয়া মুখের বেণু, মন্দ মন্দ চলে ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
নাচিতে নাচিতে যায়, নুপুরে পঞ্চম গায়,
পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে।
হৈ হৈ রাখাল বলে, শুনি সুখ সুরকুলে
গোপী বলে নাথ যায় বনে॥

মাধবী

মাধবী নীলাচলনিবাসিনী ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ শিখি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী। চৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহার পরিচয় আছে ঃ—

"মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে তার নাম গণি।"

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করিয়া যখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময় মাধবী তাঁহার দর্শন লাভ করেন, তাহাতেই তাঁহার মনে ভগবৎপ্রেমের উদয় হয়,—তিনি ভক্তিমতী হইয়া উঠেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর স্ত্রী-মুখদর্শন করিতেন না, সেই জন্য মাধবী তাঁহার সম্মুখে আসিতে পাইতেন না; তিনি লুকাইয়া-লুকাইয়া চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমে-আত্মহারা মূর্ত্তি দেখিতে-দেখিতে নিজেও আত্মহারা হইতেন। চৈতন্যের নিকটে

আসিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত খেদ হইত; সেই খেদে তিনি গাহিয়াছেন :—

"যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে ॥"

মাধবী দেবীর অনেক পদ 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যায়। পদগুলি ভাবে, ভাষায়, অতি সুন্দর; ভক্তির উচ্ছ্বাসে শ্রীসম্পন্ন।

মাধবী দেবীর পদগুলি ঐতিহাসিকত্বেও পূর্ণ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দন্তভাঙার কলহ, জগদানন্দের নবদ্বীপ যাত্রা, দোললীলা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক বিষয়ের বিবরণ তাঁহার রচিত পদে পাওয়া যায়।

জগন্নাথ-মন্দিরের দৈনিক-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখক নিযুক্ত থাকিত; মাধবীর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল বলিয়া এবং তাঁহার রচনামাধুর্য্যে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ

হইয়া, রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, মাধবী দেবীকে এই সম্মানের পদ দান করিয়াছিলেন। চরিতামৃতে এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে :—

"শিখি মাইতির ভগ্নী শ্রীমাধবী-দেবী।
বৃদ্ধ তপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যেই রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ।
শিখি মাইতি তার ভগিনী-অর্দ্ধ॥

সাড়ে-তিন জন বলিবার অর্থ :—স্বরূপ, দামোদর ও রামানন্দকে পুরা তিন জন ধরা হইয়াছে এবং মাধবী দেবী স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধেক বলা হইয়াছে।

অনেকে বলেন মাধবীর কবিতা বলরাম দাস, গোবিন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতির কবিতা অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। মাধবী-রচিত দুইটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১)

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
সেবক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥

নিতাই বিরহ অনলে ভেল অন্ধ।
আঠার নালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ॥
সিংহদুয়ারে গিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
গুরে কৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে,
নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বুনদ হেম যিনি, গৌরাঙ্গ বরণ খানি,
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেম-ভরে গর গর, আঁখিযুগ ঝর ঝর,
হরি হরি বোল্ বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ, ভ্রমে পহু দেশ দেশ,
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসীতে কয়, অপরূপ গোরা রায়,
ভক্তগৃহে করল প্রবেশ॥

(২)

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে,
গোকুলপুরের ছন্দ॥

ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে চায়॥
লতা তরু যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন,
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটি আঁখি
ফুল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকারি, ডুকরি ডুকরি,
গোরাচন্দ নাম লইয়া॥
ধেনু যুথে যুথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর, পণ্ডিত ঠাকুর,
পড়িলা আছাড়ে গা॥

আনন্দময়ী

আনন্দময়ী দেবী ফরিদপুরের অন্তর্গত জগসা-গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কবি ও সাধক লালা রামগতি রায়ের কন্যা এবং পয়গ্রামের পণ্ডিত কবীন্দ্র অযোধ্যারামের পত্নী ছিলেন।

আনন্দময়ী পিতার নিকট বঙ্গভাষায় ও সংস্কৃতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদুষী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা শুনা যায়। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন। বিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের রচনা ভ্রমপূর্ণ ছিল; আনন্দময়ী সেই সকল ভুল দেখিয়া বিদ্যালঙ্কারের পিতা বিদ্যাবাগীশ

মহাশয়কে তিরস্কার করিয়া লিখিয়া পাঠান যে, পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অমনোযোগী। সংস্কৃত-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে শিবপূজাপদ্ধতির ঐ সকল ভুল আনন্দময়ী কখনোই ধরিতে পারিতেন না। একসময়, রাজা রাজবল্লভ পণ্ডিত রামগতির নিকট হইতে 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের প্রমাণ এবং ঐ যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া পাঠান। রামগতি তখন পুরশ্চরণে ব্যাপৃত ছিলেন, কাজেই তিনি নিজে সে ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কন্যার পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি কন্যাকেই সে-ভার অর্পণ করিলেন। তখন আনন্দময়ী ঐ যজ্ঞের প্রমাণ ইত্যাদি লিখিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রামগতি তখনকার একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ হইবে, এই জন্যই তাঁহার নিকট উহা চাহিয়া পাঠান

হয়; তিনি তাহা দিতে পারিলেন না, তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার কন্যা লিখিয়া দিলেন; কিন্তু তাহাই রাজসভার পণ্ডিতদিগের দ্বারা বিনা-আপত্তিতে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আনন্দময়ীর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার পিতার অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া কেহ মনে করিতেন না, এবং সে সম্বন্ধে রাজসভার কোনো পণ্ডিত মনের কোণেও কোনো সন্দেহ পোষণ করিতেন না।

আনন্দময়ী যে শুধু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নানাবিধ খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত লালা জয়নারায়ণ রায় একজন কবি ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার রচিত "হরিলীলা"য় আনন্দময়ীর অনেক রচনা সন্নিবিষ্ট আছে। আনন্দময়ীর রচনা স্থানে স্থানে বেশ পাণ্ডিত্য ও আড়ম্বর-পূর্ণ। তিনি যে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ

ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনার শব্দচয়ন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সমগ্র রচনা পাওয়া যায় না। আনন্দময়ীর লেখার কিঞ্চিৎ নমুনা আমরা নিম্নে দিতেছি। চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বিবাহকালে রমণী-সভার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরোক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ়-রূপা ও রূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি ॥
কত চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুনামা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা ॥
করে দৌড়িদৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া ॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড-ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠা-দষ্টা ॥
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার কুর্পাস বিস্রস্ত কক্ষে ॥

গলদ্বস্ত্রভূষণা কেহ নাহি বাস অঙ্গে।
গলদ্রাগিণী কেউ মাতিয়া সুরঙ্গে॥
কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশে।
রহিয়া সাধুবাক্য বক্তৃ প্রকাশে॥

*　　*　　*

তাহার পর, চন্দ্রভাণ যখন বিদেশে, তখন বিরহিণী সুনেত্রার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন:—

আসি দেখহ নয়নে।
হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি।
ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চিরবিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথপানে॥

*　　*　　*

ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
নাহি সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছি আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥

শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সেই বুক করি করাঘাত ॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে ॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরি ॥

* * *

'হরিলীলা' ছাড়া জয়নারায়ণ-রচিত চণ্ডী' কাব্যেও আনন্দময়ীর লেখা স্থান পাইয়াছে। আনন্দময়ী-রচিত "উমার বিবাহ" বিশেষ প্রসিদ্ধ; এখনও তাহা অনেকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন; নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভাত সময় জানি গিরিরাজ-রাণী।
অতি হরষিতে অতি পীযূষের বাণী ॥
মায়া সব জায়া আইসা নিমন্ত্রণ কর।
স্ত্রী-আচার রীত নানা গীত মঙ্গলের ॥
শুনি হরষিতে সবে অমনি ধাইল।
অমর নগর আদি সর্ব্বত্র বলিল ॥

আইল অনেক আর দেব-ঋষি নারী ।
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কত স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥
যত নারী দীর্ঘকেশী ভুরু ভুজঙ্গিনী ।
তিল-পুষ্প জিনি নাসা কুরঙ্গ-নয়নী ॥
সুমধ্যমা পীনস্তনা চম্পকবরণা ।
বিম্বাধরা স্মিতমুখী মুকুতা দশনা ॥
স্থলপদ্ম জিনি পদ-পল্লব শোভনা ।
পরিছে বসন কত বিচিত্র রচনা ॥
চুণী মণি বহুমূল্য জড়িত রতন ।
বিদ্যুতের প্রায় সব গিরির ভবন ॥
গাহিছে মঙ্গল সবে অতি হরষিতে ।
উমার স্নানের চেষ্টা রাণীর ত্বরিতে ॥
সুতৈল হরিদ্রারস একত্র করিয়া ।
রত্ন সিংহাসনোপর উমারে বসাইয়া ॥
মাজিছে কোমল দেহ হরিদ্রার রসে ।
অঙ্গেতে ঢালিছে বারি সখি সবে হাসে ॥
স্নান করাইয়া অঙ্গ মোছায় যতনে ।
পরাইল জরী শাড়ী খচিত রতনে ॥
যে কটিতে পরাজিছে মহেশ-ডমরু ।
ধরিতে বসনভার মানিয়াছে গুরু ॥

বিচিত্র আসনোপর নিয়া বসাইল।
আনন্দে আনন্দময়ী রচনা করিল॥
শুভক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল।
সিন্দূর সহিত জয়া বিজয়া আসিল॥
শিরে বারি অল্প পূর্ব্বে দিয়াছে জানিয়া।
বান্ধিছে কবরী কেশ বেণী জড়াইয়া॥
সিন্দূরের বিন্দু দিল সীমন্ত সারিয়া।
সিঁথি শেষ ফোটা বন্দী সারিছে আঁটিয়া॥
যে নাসা হেরিয়া তিলপুষ্প পৈল ভূমে।
বিরাজিত কৈল তারে তিলক-কুসুমে॥

* * *

চরণেতে বঙ্কমল দিল তিন থরি।
পঞ্চমে ঘুঘুরা তোড়া মত সারি সারি॥
আলতার চিক পদে চাঁদের বাজার।
হেরে সুর-নারীগণ কত বারে বার॥
মালা গলে করি উমা খেলিয়াছে ফুলে।
সেঁওতি মল্লিকা যুথী চম্পক বকুলে॥

* * *

পাণিগ্রহণের পর কর একাইল।
অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল॥

দুর্গা বলি জয়কার দিয়া সবে নিল।
উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভ দৃষ্টি করাইল ॥
লাজ হোম পরে ধুম নয়নে পশিল।
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হৈল ॥
সিন্দূরের কৌটা দিল রজত থুইতে।
হাতে করি উমা নেয় বাসর গৃহেতে ॥

গঙ্গামণি

আনন্দময়ী দেবীর এক বিদুষী পিসি ছিলেন, তাঁহার নাম গঙ্গামণি। ছোট-ছোট কবিতা ও বিবাহকালে গাহিবার উপযুক্ত অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীতগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিবাহ-বাসর ঝঙ্কৃত রাখিয়াছিল; এখনও সেই গান দুই-একটি প্রাচীনা মহিলার মুখে না-কি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত সীতার বিবাহ বর্ণনা-বিষয়ক একটি কবিতার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

জনকনন্দিনী সীতা হরিষে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সিঁথিপাত হীরা মণি চুণী॥
নাসার অগ্রেতে মোতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি॥
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভমাঝে মজিয়া রহিল॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা॥
কেয়ুর কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ;
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ॥
বিচিত্র ফণিত শঙ্খ কুল পরিচিত্ত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৈছি বেষ্টিত॥
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরষে॥

বৈজয়ন্তী

ফরিদপুর-জেলার ধনুকাগ্রামে বৈদিক কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে সুপণ্ডিত ময়ূরভট্টের বংশে বৈজয়ন্তী জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত

আনন্দময়ী

আনন্দময়ী দেবী ফরিদপুরের অন্তর্গত জগসা-গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কবি ও সাধক লালা রামগতি রায়ের কন্যা এবং পয়গ্রামের পণ্ডিত কবীন্দ্র অযোধ্যারামের পত্নী ছিলেন।

আনন্দময়ী পিতার নিকট বঙ্গভাষায় ও সংস্কৃতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদুষী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা শুনা যায়। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন। বিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের রচনা ভ্রমপূর্ণ ছিল; আনন্দময়ী সেই সকল ভুল দেখিয়া বিদ্যালঙ্কারের পিতা বিদ্যাবাগীশ

মহাশয়কে তিরস্কার করিয়া লিখিয়া পাঠান যে, পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অমনোযোগী। সংস্কৃত-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে শিবপূজাপদ্ধতির ঐ সকল ভুল আনন্দময়ী কথনোই ধরিতে পারিতেন না। একসময়, রাজা রাজবল্লভ পণ্ডিত রামগতির নিকট হইতে 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের প্রমাণ এবং ঐ যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া পাঠান। রামগতি তখন পুরশ্চরণে ব্যাপৃত ছিলেন, কাজেই তিনি নিজে সে ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কন্যার পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি কন্যাকেই সে-ভার অর্পণ করিলেন। তখন আনন্দময়ী ঐ যজ্ঞের প্রমাণ ইত্যাদি লিখিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রামগতি তখনকার একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ হইবে, এই জন্যই তাঁহার নিকট উহা চাহিয়া পাঠান

হয়; তিনি তাহা দিতে পারিলেন না, তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার কন্যা লিখিয়া দিলেন; কিন্তু তাহাই রাজসভার পণ্ডিতদিগের দ্বারা বিনা-আপত্তিতে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আনন্দময়ীর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার পিতার অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া কেহ মনে করিতেন না, এবং সে সম্বন্ধে রাজসভার কোনো পণ্ডিত মনের কোণেও কোনো সন্দেহ পোষণ করিতেন না।

আনন্দময়ী যে শুধু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নানাবিধ খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত লালা জয়নারায়ণ রায় একজন কবি ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার রচিত "হরিলীলা"য় আনন্দময়ীর অনেক রচনা সন্নিবিষ্ট আছে। আনন্দময়ীর রচনা স্থানে স্থানে বেশ পাণ্ডিত্য ও আড়ম্বর-পূর্ণ। তিনি যে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ

ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনার শব্দচয়ন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সমগ্র রচনা পাওয়া যায় না। আনন্দময়ীর লেখার কিঞ্চিৎ নমুনা আমরা নিম্নে দিতেছি। চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বিবাহকালে রমণী-সভার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরোক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়-রূপা ও রূপে মজন্তি।
হসন্তি, খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুনামা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
করে দৌড়িদৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড-ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠা-দষ্টা॥
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার কুর্পাস বিস্রস্ত কক্ষে॥

গলদ্দূষভূণা কেহ নাহি বাস অঙ্গে।
গলদ্রাগিণী কেউ মাতিয়া সুরঙ্গে॥
কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশে।
রহিয়া সাধুবাক্য বক্তে প্রকাশে॥

* * *

তাহার পর, চন্দ্রভাণ যখন বিদেশে, তখন বিরহিণী সুনেত্রার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

আসি দেখহ নয়নে।
হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি।
ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চিরবিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথপানে॥

* * *

ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
নাহি সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছি আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥

শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সেই বুক করি করাঘাত ॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে ॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরি ॥

* * *

'হরিলীলা' ছাড়া জয়নারায়ণ-রচিত 'চণ্ডী' কাব্যেও আনন্দময়ীর লেখা স্থান পাইয়াছে। আনন্দময়ী-রচিত "উমার বিবাহ" বিশেষ প্রসিদ্ধ; এখনও তাহা অনেকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন; নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভাত সময় জানি গিরিরাজ-রাণী।
অতি হরষিতে অতি পীযূষের বাণী ॥
মায়া সব জায়া আইসা নিমন্ত্রণ কর।
স্ত্রী-আচার রীত নানা গীত মঙ্গলের ॥
শুনি হরষিতে সবে অমনি ধাইল।
অমর নগর আদি সর্ব্বত্র বলিল ॥

আইল অনেক আর দেব-ঋষি নারী।
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
যত নারী দীর্ঘকেশী ভুরু ভুজঙ্গিনী।
তিল-পুষ্প জিনি নাসা কুরঙ্গ-নয়নী॥
সুমধ্যমা পীনস্তনা চম্পকবরণা।
বিম্বাধরা স্মিতমুখী সুকুতা দশনা॥
স্থলপদ্ম জিনি পদ-পল্লব শোভনা।
পরিছে বসন কত বিচিত্র রচনা॥
চুণী মণি বহুমূল্য জড়িত রতন।
বিদ্যুতের প্রায় সব গিরির ভবন॥
গাহিছে মঙ্গল সবে অতি হরষিতে।
উমার স্নানের চেষ্টা রাণীর ত্বরিতে॥
সুতৈল হরিদ্রারস একত্র করিয়া।
রত্ন সিংহাসনোপর উমারে বসাইয়া॥
মাজিছে কোমল দেহ হরিদ্রার রসে।
অঙ্গেতে ঢালিছে বারি সখি সবে হাসে
স্নান করাইয়া অঙ্গ মোছায় যতনে।
পরাইল জরী শাড়ী খচিত রতনে॥
যে কটিতে পরাজিছে মহেশ-ডমরু।
ধরিতে বসনভার মানিয়াছে গুরু॥

বিচিত্র আসনোপর নিয়া বসাইল।
আনন্দে আনন্দময়ী রচনা করিল॥
শুভক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল।
সিন্দূর সহিত জয়া বিজয়া আসিল॥
শিরে বারি অল্প পূর্ব্বে দিয়াছে জানিয়া।
বান্ধিছে কবরী কেশ বেণী জড়াইয়া॥
সিন্দূরের বিন্দু দিল সীমন্ত সারিয়া।
সিঁথি শেষ ফোটা বন্দী সারিছে আঁটিয়া॥
যে নাসা হেরিয়া তিলপুষ্প পৈল ভূমে।
বিরাজিত কৈল তারে তিলক-কুসুমে॥

* * *

চরণেতে বঙ্কমল দিল তিন থরি।
পঞ্চমে ঘুঘুরা তোড়া মত সারি সারি॥
আলতার চিক পদে চাঁদের বাজার।
হেরে সুর-নারীগণ কত বারে বার॥
মালা গলে করি উমা খেলিয়াছে ফুলে।
সেঁওতি মল্লিকা যুথী চম্পক বকুলে॥

* * *

পাণিগ্রহণের পর কর একাইল।
অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল॥

দুর্গা বলি জয়কার দিয়া সবে নিল।
উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভ দৃষ্টি করাইল ॥
লাজ হোম পরে ধুম নয়নে পশিল।
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হৈল ॥
সিন্দূরের কৌটা দিল রজত থুইতে।
হাতে করি উমা নেয় বাসর গৃহেতে ॥

গঙ্গামণি

আনন্দময়ী দেবীর এক বিদুষী পিসি ছিলেন, তাঁহার নাম গঙ্গামণি। ছোট-ছোট কবিতা ও বিবাহকালে গাহিবার উপযুক্ত অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীতগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিবাহ-বাসর ঝঙ্কৃত রাখিয়াছিল; এখনও সেই গান দুই-একটি প্রাচীনা মহিলার মুখে না-কি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত সীতার বিবাহ বর্ণনা-বিষয়ক একটি কবিতার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

জনকনন্দিনী সীতা হরিষে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সিঁথিপাত হীরা মণি চুণী॥
নাসার অগ্রেতে মোতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি॥
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভমাঝে মজিয়া রহিল॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা॥
কেয়ুর কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ॥
বিচিত্র ফণিত শঙ্খ কুল পরিচিত্ত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৈছি বেষ্টিত॥
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরষে॥

বৈজয়ন্তী

ফরিদপুর-জেলার ধনুকাগ্রামে বৈদিক কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে সুপণ্ডিত ময়ূরভট্টের বংশে বৈজয়ন্তী জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত

অনুরাগ ছিল। বৈজয়ন্তীর যখন ভালো করিয়া কথা ফুটে নাই, তখন হইতেই তিনি তাঁহার পিতার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের অনুকরণে হাতে পুঁথি লইয়া পাঠাভ্যাসের ভাণ করিতেন। বৈজয়ন্তীর পিতা, কন্যার এই পাঠানুরাগ দেখিয়া, তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করেন এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে থাকেন। শুনা যায়, অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বর্ণজ্ঞান এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। কাব্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা শেষ হইলে বৈজয়ন্তী দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা যখন ছাত্রদিগকে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা দিতেন, সেই সময় বৈজয়ন্তী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতেন এবং গুরুশিষ্যের মধ্যে দর্শনসম্বন্ধীয় যত তর্ক উঠিত, তাহার মীমাংসা যত্নের সহিত স্মরণ করিয়া রাখিতেন।

কোটালিপাড়ার দুর্গাদাস তর্কবাগীশের পুত্র পণ্ডিত কৃষ্ণনাথের সহিত বৈজয়ন্তীর বিবাহ হয়। দুর্গাদাস তর্কবাগীশ বৈজয়ন্তীর পিতা অপেক্ষা বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার পুত্রের সহিত বৈজয়ন্তীর বিবাহ হইতে পারিত না; কেবল বৈজয়ন্তীর বিদুষী-খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া এ বিবাহে তিনি সম্মত হইয়াছিলেন। পিতা কৌলিন্যাভিমান ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের সে দুর্জ্জয় অভিমান কিছুতেই গেল না;—এ বিবাহে বাহিরে তিনি পিতার ইচ্ছার বিপক্ষতাচরণ করিলেন না বটে, কিন্তু মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন।

যতদিন শ্বশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন বৈজয়ন্তী মধ্যে-মধ্যে শ্বশুর-ঘর করিয়া আসিতেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, হীন-বংশের খোঁটা দিয়া স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করেন। স্বামীসুখে বঞ্চিতা হইয়া বৈজয়ন্তী

পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়ের সকল কষ্ট তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া ভুলিয়া থাকিতেন ;—ন্যায়, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি যত-কিছু শিখিবার ছিল এই সময়ই তিনি সে সব শিক্ষা করেন।

এইভাবে বহুদিন কাটাইয়া অবশেষে বৈজয়ন্তী নিজের দুঃখ বর্ণনা করিয়া স্বামীকে একখানি পত্র লেখেন ; কৃষ্ণনাথ ছন্দে গাঁথা সেই করুণ কাহিনী পড়িয়া দুঃখবিগলিত হন এবং স্ত্রীর কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে সামান্য অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের স্ত্রীর প্রতি তিনি এতদিন অত্যন্ত অবিচার করিয়া আসিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার হৃদয় অনুতপ্ত হইয়া উঠে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া স্ত্রীকে নিজের ঘরে লইয়া আসেন।

স্বামী-গৃহে আসিয়া বৈজয়ন্তী লেখাপড়ার চর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। সংসারের সমস্ত

কাজের পর অবসর করিয়া লইয়া স্বামীর নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন।

তাঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিত। শুনা যায়, একদিন তিনি ছাত্রদিগকে কোনো প্রাচীন দর্শন পড়াইতেছিলেন; উক্ত গ্রন্থের একস্থানে "অত্রতু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্" এইরূপ লিখিত ছিল; পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ এই বাক্যের অর্থ করিতেছিলেন—"এস্থানেও বলা হয় নাই, ওস্থানেও বলা হয় নাই।" কিন্তু এই অর্থে পাঠ সুসঙ্গত না হওয়াতে, তিনি সন্তুষ্ট হইতে পরিতেছিলেন না। যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে-ভাবিতে বেলা অনেক হইল। এদিকে বৈজয়ন্তী ঠাকুরাণী রন্ধন শেষ করিয়া বসিয়া আছেন; এমন সময় জনৈক ছাত্র কোনো কার্য্যোপলক্ষে রন্ধন-

শালায় আসিলে বৈজয়ন্তী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ স্নানাহার বন্ধ করিয়া তোমরা এত বেলা পর্য্যন্ত কি পড়িতেছ?" তখন সেই ছাত্র বলিল, আজ "অত্রতু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্" এই পাঠটির কিছুতেই সঙ্গত অর্থ হইতেছে না। তখন বৈজয়ন্তী বলিলেন—"এখন কর্ত্তাকে স্নানাহার করিয়া বুদ্ধি স্থির করিতে বল, পরে আপনিই অর্থ বাহির হইবে।"

কৃষ্ণনাথ ছাত্রের মুখে তাঁহার গৃহিণীর কথা শুনিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া শিষ্যগণসহ স্নানাদি করিতে গমন করিলেন। এদিকে বৈজয়ন্তী, ছাত্রের মুখে শুনিবামাত্র পাঠের যথার্থ অর্থ স্থির করিয়া লইয়াছিলেন; তারপর স্বামী যখন স্নানে ব্যাপৃত সেই সুযোগে লুকাইয়া পুস্তকখানি খুলিয়া উহার পদচ্ছেদ করিয়া "অত্র তু ন উক্তং তত্র অপি ন উক্তম্" এইরূপ লিখিয়া রাখিলেন। স্নানান্তে গৃহে

আসিয়া কৃষ্ণনাথ আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রামার্থে শয়ন করিলেন। পরে বৈকালে ছাত্রদিগকে সেই পাঠের অর্থবোধ করাইবার সময় পুস্তক খুলিয়া দেখেন—সেই দুর্ব্বোধ পাঠটি পদচ্ছেদদ্বারা কে সহজবোধ্য করিয়া রাখিয়াছে। তিনি এই কার্য্যে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং এ কাজ যে করিয়াছে তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা কেহই বলিতে পারিল না; তখন তিনি মনে-মনে বুঝিলেন তাঁহার পত্নীরই এ কাজ।

বৈজয়ন্তী দেবী অনেক সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা ও শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর সে সকলের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তৎকালে বোধহয় সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের নাম প্রচার করার রীতি ছিল না; সেই জন্য তাঁহার রচিত কবিতার সঙ্গে তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায় না। তাঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম "আনন্দলতিকাচম্পূ" নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি পত্নীকে তাঁহার পুস্তক-রচনার সহকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"আনন্দলতিকাগ্রন্থো যেনাকারি স্ত্রীয়া সহ।"

স্ত্রীর নাম প্রকাশ করা রীতিবিরুদ্ধ মনে করিয়া বোধ হয় পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ নিজের নামেই "আনন্দলতিকা" প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের রচনা-ভঙ্গীর মধ্যে এতটা পার্থক্য আছে যে একটু অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে বোঝা যায় কোন্‌গুলি বৈজয়ন্তী দেবীর আর কোন্‌গুলি কৃষ্ণনাথ পণ্ডিতের রচনা।

বৈজয়ন্তী দেবী কেবল যে রচনা-বিষয়ে নিপুণা ছিলেন তাহা নহে, তিনি অতি ক্ষিপ্রহস্তাও ছিলেন। শুনা যায়, "আনন্দ-লতিকা" রচনাকালে একদিন পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সন্ধ্যা হইতে শেষরাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া নায়িকার

রূপবর্ণন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বৈজয়ন্তী দেবী স্বামীকে বলিলেন—"এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা স্ত্রীলোকের রূপবর্ণন করিতেছ! দেখ আমি এক শ্লোকে তোমার নায়িকার তিন অঙ্গ বর্ণন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আনন্দ-লতিকার জন্য এই শ্লোকটি লিখিয়া দিলেনঃ—

"অহরয়ং কলধৌত গিরিভ্রমাৎ
স্তনমগাৎ কিলনাভিহ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ
শ্রবণসীমনি কিং সমুপস্থিতে॥"

বৈজয়ন্তী দেবী যে বঙ্গীয় বিদুষীগণের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালিনী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে আনন্দলতিকা গ্রন্থের রচনাকাল অনুসরণ করিলে অনুমান হয়, তিনি ১৫৫০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনন্দলতিকা গ্রন্থ তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রচিত হয়।

মানিনী দেবী

উত্তর-বঙ্গে প্রখ্যাতনামা ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি নামে এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। মানিনী দেবী তাঁহারই কন্যা। ভ্রাতা ধনেশ্বর যখন বিদ্যারম্ভের পর বর্ণমালা শিখিতেন তাহা শুনিয়াই মানিনীর বর্ণমালাজ্ঞান হয়—তাঁহাকে পৃথকভাবে শিখাইবার আবশ্যক হয় নাই। তাহার পর ভ্রাতা যখন ব্যাকরণ শিখিতে আরম্ভ করেন মানিনীও তাহা কেবল শুনিয়াই শিখিয়াছিলেন। সেকালে সায়ংসন্ধ্যোপাসনার পর অধ্যাপক ছাত্রদিগকে পূর্ব্বপঠিত গ্রন্থাংশের পরীক্ষা করিতেন, তাহার নাম ছিল জিজ্ঞাসা-বাদ। এই জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রগণ উত্তর করিতে অসমর্থ হইলে, তাহারা পূজার জন্য সুন্দর পুষ্প আহরণ করিয়া দিবে এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া, মানিনীর নিকট হইতে উত্তর জানিয়া লইত।

স্মৃতিতত্ত্বে মানিনী দেবীর সম্যক ব্যুৎপত্তি

ছিল। একুশ দিনের পুত্রকে রাখিয়া যখন মানিনী মৃতপতির শবের পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন পিতৃব্য হরিনারায়ণ তাঁহাকে এই কথা বলিয়া বাধা দেন যে, শিশুপুত্রকে রাখিয়া সহমরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু মানিনী সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি শাস্ত্রীয় তর্কদ্বারা পিতৃব্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সেরূপ সহমরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, এবং হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। যে একুশ দিনের পুত্রকে রাখিয়া মানিনী সহমৃতা হন সেই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার রুদ্রমঙ্গলের তুল্য নৈয়ায়িক সে সময়ে নবদ্বীপেও কেহ ছিলেন না।

মানিনী সংস্কৃতভাষায় অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন; অনেকের সে সকল কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার কৃত শিবস্তোত্র হইতে তিনটি কবিতা উদ্ধৃত হইল:—

তরণির্ধরণিঃ সলিলং পবনো
গগনঞ্চ বিরিঞ্চিসুত ত্বতনোঃ।
শশলাঞ্ছনভূষণ চন্দ্রকলা
স্তনবস্তব যোষজতে সচতে ॥

তমসি ভ্রমসীশ্বর তেজসি চ
প্রথমেশ গিরৌ জলধৌ বসসি।
অবনৌ গগনে চ গুহাসু পিত
হৃদিয়েঽসি বহিশ্চ দধাসি জগৎ।

করুণা জলধে হরিণাঙ্ক শিরো
গিরিরাজসুতা দয়িত প্রণতাং।
তবপাদসরোরুহ কিঙ্করিকাং
সকনাদ্ধরসেব্য সমুদ্ধর মাং ॥

প্রিয়ংবদা

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়ায় শিবরাম সার্ব্বভৌম নামে এক অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যশঃ-

সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া নানা দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার কুটীরে শিক্ষা লাভ করিত ;—এই ছাত্রবৃন্দ লইয়া শিবরাম তাঁহার তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নির্জ্জন পল্লীকুটীরে অধ্যাপনা করিতেন। প্রতিদিন যখন শিবরাম শিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া চতুষ্পাঠীমণ্ডপে উপবেশন করিতেন, তখন তাঁহারই ঠিক পাশে বসিয়া তাঁহার কন্যা, এক ক্ষুদ্র বালিকা, উৎকর্ণ হইয়া কাব্য পাঠ ও আলোচনা শুনিত। বালিকা সে আলোচনার বিন্দুবিসর্গ বুঝিত না, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের সুমিষ্ট সুর তাহার প্রাণে আনন্দের ঢেউ তুলিত। সেই আনন্দ তাহাকে আদরের খেলাঘর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভয়ের শিক্ষামণ্ডপের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া রাখিত। ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যখন এই বালিকা সরস্বতী-বন্দনা গাহিবার আদেশ লাভ করিত, ছাত্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া যখন সে মধুরকণ্ঠে

যা কুন্দেন্দুতুষারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভূজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা॥

গানটি গাহিয়া শেষ করিত, তখন তাহার প্রাণ যে আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সে আনন্দ সে খেলাঘরের কোনো খেলার মধ্যেই পাইত না। তাহার পর দিনান্তে চতুষ্পাঠীর ছুটি হইলে, সেদিনকার আলোচিত শ্লোকগুলির মধ্যে অধিকাংশ অবিকল মুখস্থ বলিয়া বালিকা শিবরামকে সেই প্রসঙ্গেই নানারূপ অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তাহার মুখে আর অন্য কোনো কথাই থাকিত না।

বালিকার এই অপূর্ব্ব মেধাশক্তি দেখিয়া ও তাহাকে শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী জানিয়া শিবরাম তাঁহার ছাত্রবর্গের পাশে এই নূতন ছাত্রীটির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বালিকা অসীম উৎসাহে শিক্ষাগ্রহণ

করিতে লাগিল, তাহার অসীম মেধাশক্তিবলে ও তীক্ষ্ণ প্রতিভায় শীঘ্রই সে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল,—ছাত্রবর্গের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিয়া সে দিন দিন প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে লাগিল।

প্রতিদিন সেই নির্জ্জন কুটীরের পাঠমণ্ডপে বসিয়া অদম্য আগ্রহে সরস্বতীর মত এক বালিকা কাব্য-পাঠ ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছে—সহপাঠীদিগের সহিত সমান হইয়া তর্ক করিতেছে, মধুরকণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি ও বন্দনাগান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছে, এই দৃশ্য পণ্ডিত শিবরামের অন্তঃকরণকে আনন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিল, ছাত্রবর্গকে উৎসাহে উন্মত্ত করিয়া দিল এবং সহপাঠী-দিগের মধ্যে পশ্চিমবাসী এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের মনে সেই বালিকার প্রতি অনুরাগের বীজ সঞ্চার করিল। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান বাংলা ভাষা জানিতেন না বলিয়া বালিকার সহিত

বাক্যালাপের খুব ইচ্ছা থাকিলেও তাহার সহিত মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না; কিন্তু বালিকা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে শিখিয়া তাঁহার ক্ষোভের নিবৃত্তি করিল। এই পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান রঘুনাথ মিশ্রের সহিতই প্রিয়ংবদার বিবাহ হয়।

প্রিয়ংবদা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ ও সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করিতে শিখিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না;—নিজে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিবার জন্য পিতার নিকট শিক্ষা লইতে লাগিলেন। বালিকাবয়সে সংস্কৃত ছন্দের যে সুমধুর সুর বারম্বার তাহার হৃদয়কন্দরে আঘাত করিয়াছিল এখন তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে আরম্ভ করিল। পিতার আদেশে প্রিয়ংবদা প্রথম যেদিন গৃহপ্রতিষ্ঠিত কুল-দেবতা গোবিন্দদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া

কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চিতং
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈরঙ্গৈস্ত্রিভঙ্গং ভজে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলং

এই শ্লোকটি রচনা করিলেন এবং ছাত্রমণ্ডলীর মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাঠ করিলেন, তখন শিবরাম কন্যার মুখের পানে চাহিয়া আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না ;—ছাত্রমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পর, প্রায় প্রতিদিন তিনি দেবোদ্দেশে নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর স্বামী-গৃহে আসিয়া প্রিয়ংবদা বিদ্যা-আলোচনা ত্যাগ করেন নাই ;—উত্তরোত্তর তাঁহাব বিদ্যানুরাগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। স্বামী সামান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন ; সাংসারিক কাজ চালাইবার জন্য সংসারে বেশি লোক ছিল না, প্রিয়ংবদাকে স্বহস্তে সকল কাজ করিতে হইত। বিদুষী

ছিলেন বলিয়া অভিমানে তিনি সাংসারিক কাজকে কখনও তুচ্ছ করেন নাই ;—স্বামীর পরিচর্য্যা, গৃহমার্জ্জন, গৃহশোধন, পূজার আয়োজন, রন্ধন, অতিথিসেবা ও গো-সেবা প্রভৃতি সকল কাজই তিনি নিজ-হস্তে সমাধা করিয়া যে অবসর পাইতেন সেইটুকু কাল বৃথা ব্যয় না করিয়া শিক্ষা-আলোচনায় কাটাইতেন। এইখানেই তাঁহার গৌরব বিশেষভাবে ফুটিয়াছে ;—বিদ্যার অভিমান তাঁহাকে সাংসারিক কাজগুলিকে দাসীর কাজ বলিয়া হেয়জ্ঞান করিতে শিখায় নাই,—যে হস্তে তিনি কাব্যরচনা করিতেন সেই হস্তেই সম্মার্জ্জনী ধরিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। শিক্ষিতা স্ত্রীর আদর্শ যদি খুঁজিতে হয় তাহা হইলে আমরা যেন এই প্রিয়ংবদার চরিত্রের মধ্যেই তাহা অন্বেষণ করি।

প্রিয়ংবদা ছেলেবেলা হইতে মধুরকণ্ঠে গাহিতে পারিতেন, সেইজন্যই তাঁহার নাম

প্রিয়ংবদা হইয়াছিল। তিনি স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন, স্বামীর কথা তিনি বেদবাক্যের ন্যায় পালন করিতেন। তাঁহার স্বামীর অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তিনি তাহাদিগকে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করাইতেন, জননীর ন্যায় স্নেহে তাহাদিগকে পালন করিতেন, রোগে শুশ্রূষা করিতেন।

প্রিয়ংবদার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। শুনা যায়, তিনি দুই পক্ষ সময়ের মধ্যে অমরকোষ, স্বাদি হইতে চুরাদি পর্য্যন্ত গণ এবং মহাভারতীয় সাবিত্রী ও দময়ন্তী উপাখ্যানের মূল অংশ দুইটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বিবাহিত জীবনে সময়াভাবে তিনি লেখাপড়ায় ভালো করিয়া মন দিতে পারিতেন না; কিন্তু এই স্বল্প অবসরের মধ্যেই তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং ভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের একখানি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

প্রিয়ংবদার হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল; তাঁহার স্বামী কাশী হইতে সংস্কৃত অক্ষরে লেখা অনেক শাস্ত্রীয় পুঁথি আনিয়াছিলেন, তিনি সেইগুলি বাংলা অক্ষরে নকল করিতেন। প্রথমে কাব্য আলোচনায় প্রিয়ংবদার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; তিনি তখন কেবল কাব্যই পাঠ করিতেন; কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর নিকট উৎসাহ পাইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করেন।

একটি বাঙালি ব্রাহ্মণ-কন্যা সমস্ত দিনের অসংখ্য গৃহকর্ম্ম-শেষে অবসর লইয়া, নির্জ্জন গৃহকোণে স্বামীর পাদমূলে শুচি হইয়া বসিয়া দর্শনশাস্ত্রের কূটপ্রশ্ন সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন;—স্বামীর মুখ হইতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ-বিস্ফারিত নয়ন স্বামীর মুখের উপর স্থির হইয়া পড়িয়া আছে—এই পবিত্র দৃশ্য মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদিগকে পুলকিত করিয়া তোলে।
